আমদানি-রপ্তানি :
প্রচলিত রূপ ও শরয়ী রূপরেখা

মূল
শায়খুল ইসলাম
মুফতি মুহাম্মদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম

ভাষান্তর ও টীকা সংযোজন
মুফতি শাব্বীর আহমাদ
নায়েবে তালিমাত, সিনিয়র মুহাদ্দিস ও মুফতি :
মাদরাসা বাইতুল উলুম, ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা।
খতিব : ডিআইটি প্লট জামে মসজিদ, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা।

মাকতাবাতুল হেরা

সূচিপত্র

বিষয়

রপ্তানিবাণিজ্যের শরয়ী বিধান ■

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রশ্নোত্তর পর্ব ■

পূর্বকথা

কিছুদিন আগের কথা। উসতাদে মুহতারাম শায়খুল ইসলাম আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম বাংলাদেশ সফরে আসবেন। হযরতের সফর উপলক্ষে একটি প্রস্তুতিমূলক আলোচনাসভা হলো। সেখানে দেশের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় আলেম এবং হযরতের ছাত্রবৃন্দ উপস্থিত হলেন।

উক্ত আলোচনা শেষে স্বনামধন্য একজন বিজ্ঞ মুফতি সাহেব একটি কথা বললেন, যা আমার নিকট বেশ গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো। তিনি বললেন, 'অনেক বিষয় আমাদের উপর ফরয; কিন্তু আমরা তা আদায়ের কথা চিন্তা করি না। যেমন : ধরুন, সতর ঢাকা ফরয আর ফরয যার উপর নির্ভরশীল হয় তা-ও ফরয হয়ে থাকে। তাই সতর ঢাকা পরিমাণ কাপড়ের ব্যবস্থা করা, এই পরিমাণ কাপড় তৈরীর জন্য সুতার ব্যবস্থা করা এবং সেই পরিমাণ সুতার জন্য তুলার ব্যবস্থা করাও ফরয। কিন্তু কথা হলো, বাংলাদেশে যে পরিমাণ তুলা চাষ হয় তা দ্বারা যে কাপড় তৈরি হবে তা দিয়ে মানুষের সতর ঢাকা তো দূরের কথা অন্তর্বাসেরও ব্যবস্থা সম্ভব নয়। তাই এখন তুলা আমদানি করতে হবে। অতএব সতর ঢাকা সমপরিমাণ তুলা আমদানি করাও ফরয। আর আমদানির জন্য সুদমুক্ত শরিয়তসম্মত পন্থা উদ্ভাবন করাও ফরয। আর যেহেতু আলেমগণ উম্মাহর পথপ্রদর্শক, তাই তাদের জন্য এই আমদানি-রপ্তানি-বিষয়ক মাসআলা জানা এবং সে আলোকে ব্যবসায়ীদের রাহনুমায়ী করাও ফরয।'

কথাগুলো আমার অন্তরে রেখাপাত করল। মনে হলো, এ ফরয দায়িত্ব আদায়কল্পে স্বতন্ত্র পুস্তিকা প্রয়োজন।

বলাবাহুল্য, আমাদের সব বিষয়ের সাথে সুদ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছে, অথচ সুদের ব্যাপারে কুরআন ও হাদিসে যেসব সতর্কবাণী এসেছে তা শুনলে যেকোনো মুসলমানের অন্তর কেঁপে ওঠে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

الربوا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه

সুদের ভয়াবহতার সাতাত্তরটি শাখা রয়েছে। সবচেয়ে নিম্নস্তরের শাখাটি মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার নামান্তর।[১]

---

১. শুআবুল ঈমান, হাদিস নং-৫৫২০।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

درهم ربوًا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية

জ্ঞাতসারে সুদের এক দিরহাম খাওয়া ৩৬ বার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া থেকেও জঘন্য।[২]

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

যদি তোমরা সুদ পরিত্যাগ না করো, তা হলে আল্লাহ ও তার রাসুলের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও।[৩]

প্রিয় পাঠক, আপনিই ফায়সালা করুন, কারও অন্তরে যদি সামান্য ঈমানও থাকে, তা হলে তার হৃদয় কি ভয়ে কেঁপে উঠবে না?

উসতাদে মুহতারাম শায়খুল ইসলাম দামাত বারাকাতুহুমকে আল্লাহ তায়ালা সুস্থতার সাথে দীর্ঘ হায়াত দান করুন। আমিন। তিনি আমদানি-রপ্তানির শরয়ী রূপরেখাও সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন।

বক্ষ্যমাণ পুস্তিকা হযরতের অনবদ্য গ্রন্থ فقه البيوع এর আমদানি-রপ্তানি শীর্ষক আলোচনা এবং *ফিকহি মাকালাতে* প্রকাশিত রপ্তানি শীর্ষক সেমিনারে প্রদত্ত একটি সারগর্ভ ভাষণের সরল অনুবাদ। আর সাথে বিভিন্ন স্থানে সংযোজিত অধমের কিছু টীকা। আমি এগুলো বিন্যস্ত আকারে পেশ করার চেষ্টা করেছি। আশা করি, আমরা এর দ্বারা আমদানি-রপ্তানির শরয়ী রূপরেখা সম্পর্কে জানতে পারব। আমদানি-রপ্তানি-প্রক্রিয়ায় মানুষ সুদের লানত থেকে বাঁচার পথ পেয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের তাওফিক দান করুন। আমিন।

মহররম ১৪৩৯ হিজরি

শাব্বীর আহমাদ

দারুল ইফতা : মাদরাসা বাইতুল উলুম,

৮৩/এ ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪।

---

২. মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং-২১৯৫৭।

৩. সুরা বাকারা, আয়াত : ২৭৯।

بسم الله الرحمن الرحيم

আধুনিক যোগাযোগমাধ্যম আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে মানুষ সশরীরে উপস্থিত হয়েই ক্রয়-বিক্রয়ের সব কাজ আনজাম দিত। দু' শহর বা দু'দেশের বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এ ধারার ব্যতিক্রম ছিল না। উভয়পক্ষের উপস্থিতিতেই বৈদেশিক বাণিজ্যের সব কাজ সমাধা হতো। ক্রেতা বা তার প্রতিনিধি বিক্রেতার শহরে গমন করত। অথবা বিক্রেতা বা তার প্রতিনিধি ক্রেতার শহরে উপস্থিত হয়ে বিক্রয়কার্যক্রম সরাসরি পরিচালনা করত।

কিন্তু আধুনিক যোগাযোগমাধ্যম ও আধুনিক পণ্য প্রেরণপ্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হওয়ার পর বৈদেশিক বাণিজ্যে ক্রেতা-বিক্রেতার সশরীরে উপস্থিতির প্রয়োজন থাকেনি। মানুষ এসব ক্ষেত্রে আধুনিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করতে আরম্ভ করল। আর তখন থেকে এ বেচাকেনা কখনও চিঠিপত্রের মাধ্যমে সংঘটিত হতো, কখনও টেলিফোন, টেলেক্স, ফ্যাক্স ইত্যাদির মাধ্যমে।

বলাবাহুল্য, এই প্রক্রিয়ায় মূল্য প্রদান ও পণ্য হস্তান্তর ক্রেতা-বিক্রেতার সরাসরি উপস্থিতিতে আনজাম পায় না। বরং এসব ক্ষেত্রে প্রেরণপ্রক্রিয়ার আধুনিক মাধ্যম ব্যবহৃত হয়। যেমন : ডাক, স্থলকার্গো সার্ভিস, এয়ারকার্গো ও জলজকার্গো সার্ভিস।

এ পদ্ধতিতে যেহেতু ক্রেতা-বিক্রেতা এক স্থানে একত্র হয় না, এজন্য কোনো তৃতীয়পক্ষের নিশ্চয়তা প্রদানের প্রয়োজন পড়ে, যে ক্রেতাকে পণ্য পৌঁছার নিশ্চয়তা দেবে আর বিক্রেতাকে মূল্যপ্রাপ্তির গ্যারান্টি দেবে।

মূলত এই নিশ্চয়তা প্রদানকল্পে দু' শহর ও দু'দেশের বাণিজ্যে[৪] একাধিক পদ্ধতির প্রচলন ঘটেছে। তবে এসব পদ্ধতিতে প্রকারগত ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও মৌলিকভাবে তা দু'ভাগে বিভক্ত।

---

৪. **বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব**

আমাদের দেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। জনসাধারণের চাহিদাপূরণে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, খাদ্যসামগ্রী; শিল্প উন্নয়নের জন্য মেশিনারি ইত্যাদি

এক. ডাক-যোগে পণ্য প্রেরণ।

দুই. কোনো কার্গো সার্ভিস-যোগে পণ্য প্রেরণ।

নিম্নে আমরা উভয় প্রকার ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পাব, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র তাওফিক দাতা।

ডাকমারফত ব্যবসাবাণিজ্য

যদি বিক্রেতার উপর ক্রেতার পূর্ণ আস্থা থাকে তা হলে ভিনদেশি ব্যবসায়ীর সাথে দরদাম নির্ধারণের পর কিংবা ক্রয়চুক্তি সম্পন্ন করার পর ক্রেতা তার

আমদানি করতে হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে রপ্তানির ভূমিকাও অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। রপ্তানির মাধ্যমে দেশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে, যা দেশের চালিকাশক্তির ভূমিকা পালন করে। পৃথিবীর প্রায় দেশেরই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দু'টি দিক থাকে। একটি হলো আমদানিবাণিজ্য অপরটি রপ্তানিবাণিজ্য। উভয় প্রকার বাণিজ্যই আমদানি ও রপ্তানি এলসির মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হয়। আমাদের দেশে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর আমদানি ও রপ্তানিনীতি ঘোষিত হয়। বাণিজ্যমন্ত্রণালয়ের আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রক কর্তৃক পণ্য আমদানি ও রপ্তানিসংক্রান্ত বিষয়াবলি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। আমদানিমূল্য পরিশোধসংক্রান্ত নিয়মনীতি বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।

আমদানির জন্য লাইসেন্সিং পদ্ধতি

বিদেশ হতে পণ্য আমদানি করতে হলে আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় থেকে পণ্য আমদানির লাইসেন্স নিতে হয়। বর্তমানে আমদানিকার্যক্রম বৃদ্ধির ফলে কতিপয় বাণিজ্যিক ব্যাংককে উক্ত লাইসেন্সিংয়ের কাজ সম্পাদনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এভাবে লাইসেন্সিং সম্পাদনের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো আমদানিনীতিতে বর্ণিত নির্দেশাবলি অনুসরণ করে থাকে। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক এলসিএ ফরম তথা লেটার অব ক্রেডিট অথরাইজেশন ফরম-এর মাধ্যমে আমদানির অনুমোদন দিয়ে থাকে। আমদানিতে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গকে ব্যাংক হতে এলসিএ ফরম সংগ্রহ করতে হয় এবং এই ফরমের সাথে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রও দাখিল করতে হয়। ব্যাংক এ আবেদনপত্র এবং সংযুক্ত কাগজপত্র সতর্কতার সাথে যাচাই-বাছাই করে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিবন্ধন ইউনিটের নিকট পাঠিয়ে দেয়; তবে আমদানির ক্ষেত্রে পণ্য বিনিময়ে বাংলাদেশের নিজস্ব তহবিল হতে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় না হলে উক্ত রূপে নিবন্ধন আবশ্যক নয়। সাধারণত ব্যবসায়ীগণ এলসি খোলার পূর্বেই বিদেশি বিক্রেতা বা সরবরাহকারী বা তাদের স্থানীয় প্রতিনিধির মাধ্যমে ক্রয়চুক্তি সম্পাদন করে নেয়। এরপর এলসি খোলার জন্য ব্যাংকের শরণাপন্ন হয়। বাংলাদেশে শুধু অপ্রত্যাহারযোগ্য এলসির মাধ্যমে আমদানি করা যায়। ফলে আমদানিকারক বিদেশি সরবরাহকারীর সাথে পূর্বেই ক্রয়চুক্তি করে নেয়। —অনুবাদক।

নিকট পণ্যমূল্য পাঠিয়ে দেবে। কেননা তার এই আস্থা রয়েছে যে, ভিনদেশি বিক্রেতা পণ্যমূল্য হস্তগত করার সাথে সাথে তার নিকট বিক্রীত পণ্য পাঠিয়ে দেবে। এতে সে গড়িমসি করবে না।

অনুরূপ যদি ক্রেতার উপর বিক্রেতার পূর্ণ আস্থা থাকে তা হলে এটা হতে পারে যে, বিক্রেতা কোনো পন্থায় ক্রেতার নিকট পণ্য পাঠিয়ে দেবে। কেননা তার এই আস্থা রয়েছে যে, ক্রেতা পণ্য হস্তগত করার পর মূল্য পাঠিয়ে দেবে। এতে সে টালবাহানার আশ্রয় নেবে না।

বলাবাহুল্য, এমন হলে উভয়ের মাঝে বিক্রয়চুক্তি পত্রমারফতও সম্পন্ন হতে পারে। আবার ফোনের মাধ্যমে মৌখিকভাবেও হতে পারে। আর এমন হলে, 'আধুনিক যোগাযোগমাধ্যমে ইজাব কবুল'[৫] অধ্যায়ে আলোচিত সব বিষয় এখানে প্রযোজ্য হবে।

তদ্রূপ অনুপস্থিত দ্রব্যের বিক্রির সকল বিধিবিধানও এখানে কার্যকর হবে। ক্রেতা خيار الرؤية তথা দেখার অধিকার এবং خيار العيب তথা দোষত্রুটি-জনিত অধিকার ইত্যাদি লাভ করবে।

পক্ষান্তরে যদি ক্রেতা-বিক্রেতা একে অপরের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল না হয়—বলাবাহুল্য, অধিকাংশ সময় এমনই হয়ে থাকে—তা হলে উভয়কেই এমন

৫.

وجاء فى قرار لمجمع الفقه الاسلامى بجدة:"اذا تم التعاقد بين غائبين لايجمعهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الأخر معاينة، ولايسمع كلامه ، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أوالرسالة أوالسفارة (الرسول) وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسوب الآلى (الكمبيوتر). ففى هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله....

وما يتعلق باحتمال التزييف، أو التزوير، أو الغلط، يرجع إلى القواعد العامة للاثبات"

وأما الهاتف (التليفون) والجهاز اللاسلكى، فالتعاقد بهما كالتعاقد مشافهة، وإن كان أحدهما لا يرى الأخر، لأن ذلك ليس بشرط لصحة العقد. قال النووى رحمه الله:

"لو تناديا، وهما متباعدان، وتبايعا، صح البيع بلا خلاف"

ولهذا نص القرار السابق لمجمع الفقه الإسلامى فى مادته الثانية مايلى:

"اذا تم التعاقد بين الطرفين فى وقت واحد، وهما فى مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكى، فان التعاقد بينهما يعتبر تعاقدابين حاضرين، وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء" - كذا في فقه البيوع: ١: ٤٠

পন্থা অবলম্বন করতে হবে, যা দ্বারা প্রত্যেকেই এ নিশ্চয়তা লাভ করবে যে, এই বিক্রয়চুক্তির ফলে সে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করবে। এতে সে অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যার সম্মুখীন হবে না।

মূলত একারণেই তৃতীয়পক্ষের প্রয়োজন পড়ে; যে উভয়পক্ষের মাঝে মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করবে এবং উভয়পক্ষকে নিশ্চয়তা প্রদান করবে। এই মধ্যস্থতাকারী কখনও ডাকবিভাগ হয়ে থাকে, আবার কখনও ব্যাংক হয়ে থাকে। আমরা এখানে উভয় পদ্ধতি সম্পর্কেই আলোচনা করব। আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র তাওফিক দাতা।

ডাকযোগে তথা ভিপি-পদ্ধতিতে পণ্য প্রেরণ

যদি মধ্যস্থতাকারী ডাকবিভাগ হয় তা হলে এক্ষেত্রে অনুসৃত সাধারণ পদ্ধতি হলো Valued Parcel (ভ্যালুড পার্সেল), যাকে সংক্ষেপে VP (ভিপি)-পদ্ধতি বলা হয়। অর্থাৎ মূল্য প্রদানপূর্বক পার্সেল হস্তান্তর।

এই পদ্ধতির সারসংক্ষেপ হলো, বিক্রেতা পণ্যসংবলিত পার্সেল ডাকবিভাগে হস্তান্তর করবে এবং ডাক কর্তৃপক্ষকে এই শর্তজুড়ে দেবে যে, তারা পার্সেল ক্রেতার নিকট কেবল তখনই হস্তান্তর করবে যখন ক্রেতা ডাকবিভাগের প্রতিনিধির নিকট পণ্যমূল্য সমর্পণ করবে। তো ডাকবিভাগের প্রতিনিধি ক্রেতা থেকে মূল্য বুঝে নেওয়ার পর তার নিকট বিক্রীত পণ্য হস্তান্তর করবে। এরপর ডাকবিভাগের প্রতিনিধি উক্ত মূল্য বিক্রেতার নিকট ডাকযোগে পাঠিয়ে দেবে।

এ পদ্ধতিতে ডাক কর্তৃপক্ষ পার্সেল প্রেরণকারী বিক্রেতা থেকে ফি উসুল করে থাকে। আর বিক্রেতা সাধরণত উক্ত ফি পণ্যমূল্যের অন্তর্ভুক্ত করে দেয় এবং পার্সেল গ্রহণকারী ক্রেতা হতে তা উসুল করে নেয়। এক্ষেত্রে ডাকবিভাগ বিক্রেতার প্রতিনিধি হয়ে ক্রেতার নিকট পণ্য পৌছে দেয় এবং তার থেকে মূল্য উসুল করে থাকে। এইপর্যায়ে ডাকবিভাগের সাথে বিক্রেতার وكالة (ওকালা) চুক্তি হয়। পাশাপাশি ডাকবিভাগ যেহেতু পণ্যমূল্য উসুল করে তা বিক্রেতার নিকট পৌছে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে থাকে, এজন্য বিক্রেতার সাথে তার ইজারাচুক্তিও হয়ে থাকে।

তো এই পদ্ধতির ব্যবসাকার্যক্রমে ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু মাসআলার সমাধান জরুরি।

প্রথম মাসআলা : উভয়পক্ষের মাঝে বিক্রয়চুক্তি কখন সংঘটিত হবে?

যদি বিক্রয়যোগ্য পণ্য বিক্রেতার মালিকানাধীন এবং তার দখলে থাকে তা হলে 'ইজাব' ও 'কবুল' দ্বারা তাৎক্ষণিক বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে। ইজাব-কবুল লিখিতভাবে পত্র আদানপ্রদান দ্বারাও হতে পারে আবার মৌখিকভাবে ফোনের মাধ্যমেও হতে পারে।

পক্ষান্তরে যদি বিক্রয়যোগ্য পণ্য বিক্রেতার মালিকানাধীন না থাকে অথবা তার দখলে না থাকে তা হলে পত্র বা ফোন—কোনোভাবেই বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন করা যাবে না। কেননা এইপর্যায়ে বিক্রয়চুক্তি করা হলে মালিকানাহীন বা দখলহীন বস্তুর বিক্রয় সাব্যস্ত হবে। আর শরিয়তের দৃষ্টিতে মালিকানা ও দখল লাভের পূর্বে কোনো জিনিস বিক্রি করা নাজায়েয।

তাই এইপর্যায়ে 'ক্রেতার প্রস্তাব' ক্রয়ের প্রাথমিক আবেদন সাব্যস্ত হবে। আর বিক্রেতার বক্তব্য ভবিষ্যৎ বিক্রির ওয়াদা গণ্য হবে। পরবর্তী সময়ে বিক্রেতা যখন পণ্যের মালিকানা-স্বত্ব ও দখল লাভ করবে, তখন নতুন ইজাব-কবুলের মাধ্যমে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন করতে হবে।

অথবা تعاطى তথা পণ্যের আদানপ্রদান দ্বারাও বিক্রয়চুক্তি সংঘটিত হতে পারে। আর তা এভাবে যে, বিক্রেতা কর্তৃক পণ্য ক্রেতার নিকট পৌঁছে দেওয়া হবে। আর ক্রেতা পণ্যমূল্য ডাক কর্তৃপক্ষকে হস্তান্তর করবে। এভাবে বিনাবাক্যে শুধু লেনদেন দ্বারা বিক্রয়চুক্তি সংঘটিত হবে।

দ্বিতীয় মাসআলা :

ডাকবিভাগ কার প্রতিনিধি গণ্য হবে, বিক্রেতার না ক্রেতার?

আসলে বিষয়টি উভয়পক্ষের সম্মতির উপর নির্ভর করবে। মূলত এক্ষেত্রে তিনটি অবস্থা হতে পারে।

প্রথম অবস্থা

যদি উভয়পক্ষ এই বিষয়ে সম্মত হয় যে, ক্রেতার নিকট পণ্য পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব বিক্রেতার উপর ন্যস্ত থাকবে, তা হলে এই অবস্থায় ডাকবিভাগ বিক্রেতার প্রতিনিধি সাব্যস্ত হবে।

দ্বিতীয় অবস্থা

আর যদি উভয়পক্ষ এভাবে সম্মত হয় যে, বিক্রেতার দায়িত্ব কেবল ডাকবিভাগ পর্যন্ত পণ্য পৌঁছে দেওয়া। সে রাস্তার কোনো ঝুঁকির দায় নেবে না। এই দায়

ক্রেতার। ক্রেতা যদি এতে সম্মতি প্রকাশ করে তা হলে ডাকবিভাগ ক্রেতার প্রতিনিধি সাব্যস্ত হবে।

তৃতীয় অবস্থা

আর যদি এমন হয় যে, বিক্রেতার নিকট ক্রেতা ডাকমারফত পণ্য পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে বটে, কিন্তু চুক্তিতে এ বিষয়ে কোনো কথা উল্লেখ না থাকে যে, বিক্রেতার দায়িত্ব কেবল ডাকঘর পর্যন্ত পণ্য পৌঁছে দেওয়া নাকি ক্রেতা পর্যন্ত পণ্য পৌঁছানো তার দায়িত্ব; এমন হলে বহু আলেমদের অভিমত হলো ডাকবিভাগ বিক্রেতার প্রতিনিধি সাব্যস্ত হবে।

উপরোক্ত অভিমতের পক্ষে তাঁরা দুটি প্রমাণ পেশ করে থাকেন। প্রথমত তাঁরা বলেন, পণ্য প্রেরণের সময় ডাকবিভাগের সাথে চুক্তি বিক্রেতাই করে থাকে, ক্রেতা নয়। দ্বিতীয়ত ডাকবিভাগের পণ্য পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বের জবাবদিহিতার সম্পর্ক বিক্রেতার সাথেই হয়ে থাকে। ক্রেতার নিকট পণ্য পৌঁছানোর ক্ষেত্রে কোনো অবহেলা করলে তার দেখাশোনা বিক্রেতাই করে থাকে, ক্রেতা নয়। ফলে একথাই স্পষ্ট হয় যে, ডাকবিভাগ এক্ষেত্রে বিক্রেতার প্রতিনিধি। অতএব, ডাকবিভাগের সকল কাজ বিক্রেতার কাজ বলে গণ্য হবে।

এখন যদি ডাকবিভাগ পণ্য ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করে দেয়, তা হলে যারা একপক্ষ হতে تعاطی এর মাধ্যমে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার প্রবক্তা, তাদের অভিমত অনুযায়ী সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে।

অনুরূপ ক্রেতা যদি পণ্যগ্রহণের পূর্বেই পণ্যমূল্য ডাকপ্রতিনিধির নিকট অর্পণ করে তা হলে এর দ্বারাও উভয়ের মাঝে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে।

সুতরাং যদি পণ্যের অস্তিত্ব লাভ এবং বিক্রেতা কর্তৃক তার মালিকানা ও দখল বুঝে নেওয়ার পর মৌখিক ইজাব-কবুলের মাধ্যমে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন না করা হয়, তা হলে পণ্য হস্তান্তর বা মূল্য অর্পণ এই উভয়ের মাঝে যা আগে হবে তার দ্বারা বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে।

তৃতীয় মাসআলা : ক্রেতার নিকট পণ্যের ঝুঁকি কখন অর্পিত হবে?

পণ্য যদি পথিমধ্যে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায় বা ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায়, তা হলে এর দায়ভার কে বহন বরবে? মূলত ডাকবিভাগ কার প্রতিনিধি তা নির্ণয়ের উপর

এর উত্তর নির্ভরশীল। আমরা সম্ভাব্য তিনটি অবস্থা উল্লেখ করছি। এই অবস্থাভেদে উত্তর ভিন্ন হবে।

দ্বিতীয় অবস্থায় ডাকবিভাগ ক্রেতার প্রতিনিধি। অতএব ক্রেতাই পথের সব ঝুঁকি বহন করবে। মুফতি আযিযুর রহমান রহ. এই ফতোয়াই দিয়েছেন।[৬]

আর প্রথম সুরতে ডাকবিভাগ বিক্রেতার প্রতিনিধি হয়ে থাকে। তাই যে-পর্যন্ত তা ডাকবিভাগের নিয়ন্ত্রণে থাকবে, তা যেন বিক্রেতার দখলেই থাকল। তবে হ্যাঁ, ক্রেতা যখন সে মাল বুঝে নেবে—তা প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষ-ভাবে—তখন বিক্রেতার দখল থেকে তা বের হয়ে যাবে। যেমনটি আমরা 'কব্‌জ (দখল), ঝুঁকি ও দায় স্থানান্তর' অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

একথা স্পষ্ট হলো, ক্রেতা হস্তগত করার পূর্ব পর্যন্ত তা বিক্রেতার ঝুঁকিতেই থাকবে।

আর তৃতীয় অবস্থায়ও পণ্যের দায় বহনকারী বিক্রেতা হবে। কেননা ডাকবিভাগ এই অবস্থায় বিক্রেতার প্রতিনিধি হয়ে থাকে। এমন অভিমতই ব্যক্ত করেছেন হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. এবং মুফতি আযিযুর রহমান উসমানী রহ.।[৭]

(গ্রন্থকার বলেন) তবে আমার অভিমত হলো, কোনোপক্ষ থেকে স্পষ্ট কিছু উল্লেখ না থাকলে বিষয়টি ব্যবসায়ী রীতি ও প্রচলনের উপর নির্ভরশীল হবে। যদি এক্ষেত্রে ব্যবসায়ীসমাজে প্রচলিত রীতি এই হয় যে, তারা ডাকবিভাগকে বিক্রেতার প্রতিনিধি গণ্য করে, তা হলে এর বিধান তা-ই হবে, যা হযরত থানবী রহ. এবং মুফতি আযিযুর রহমান রহ. উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ ঝুঁকির দায় বিক্রেতাকে বহন করতে হবে। আর যদি এমন হয় যে, ব্যবসায়ী প্রচলন অনুযায়ী ডাকযোগে পণ্য পাঠানোর ক্ষেত্রে বিক্রেতা কোনো দায় বহন করে না, তা হলে ডাকবিভাগের নিকট মাল হস্তান্তর করে দেওয়ার দ্বারাই বিক্রেতা দায়মুক্ত হয়ে যাবে। এবং এরপর থেকেই পণ্য ক্রেতার ঝুঁকিতে চলে যাবে।

তবে একথা স্পষ্ট যে, আমাদের দেশের ব্যবসায়ী রীতি হলো, ডাকবিভাগ বিক্রেতার প্রতিনিধি হয়ে থাকে। অতএব মালের ঝুঁকি বিক্রেতাকেই বহন করতে হবে। যেমনটি উল্লেখিত আলেমদ্বয় বলেছেন।

---

৬. দ্রষ্টব্য : ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ : ১৪:৩৭৭, ৩৭৮

৭. দ্রষ্টব্য : ইমদাদুল ফাতাওয়া : ৩:১৩৭, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম : ১৪:৩৮১

আর যদি পণ্য এয়ারকার্গোতে পাঠানো হয়, অথবা শিপ বা স্থলকার্গো-যোগে, তা হলে ব্যবসায়ী রীতি হলো কার্গো কোম্পানি ক্রেতার প্রতিনিধি হয়ে থাকে। প্রশাসনিক আইনেও এমনটি উল্লেখ আছে। বিক্রয়সংক্রান্ত আইনের ব্যাখ্যা দ্বারাও একথাই প্রতিভাত হয়।[৮]

চতুর্থ মাসআলা : পার্সেল বুঝে নেওয়ার পর ডাকবিভাগের নিকট তা আমানত হিসেবে থাকবে নাকি জামানত হিসেবে?

বাহ্যত আমানত হিসেবে থাকাটাই প্রতীয়মান হয়। কেননা, ডাকবিভাগ হয়তো বিক্রেতার উকিল হবে অথবা ক্রেতার। আর উকিলের কব্জ (দখল) আমানত সাব্যস্ত হয়।

অতএব ডাকবিভাগের কোনোপ্রকার অবহেলা উদাসীনতা বা সীমালঙ্ঘন ছাড়া যদি তা নষ্ট হয়ে যায়—যেমন : যথাযথ পন্থায় সংরক্ষণ সত্ত্বেও পার্সেলটি চুরি হয়ে গেল। অনুরূপ ডাকপ্রতিনিধির কোনোপ্রকার সীমালঙ্ঘন ছাড়া পথিমধ্যে তা নষ্ট হয়ে গেল অথচ ডাকবিভাগের সাধারণ রীতিনীতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবেই পালন করা হয়েছে, তা হলে এই ক্ষতির দায় বিক্রেতা বা ক্রেতার উপরই বর্তাবে। অর্থাৎ ডাকবিভাগ যার প্রতিনিধি তার উপর বর্তাবে। ডাকবিভাগের উপর এর দায় বর্তাবে না।

কোনো কোনো দেশে ডাকবিভাগে অনুসৃত এই পদ্ধতিও রয়েছে যে, ডাক কর্তৃপক্ষ উক্ত জিনিসের বীমা করিয়ে নেয়। অর্থাৎ ডাকবিভাগ এই দায় গ্রহণ করে যে, তারা হুবহু এই পার্সেল পৌঁছাবে এবং এর নিশ্চয়তা প্রদান করে। সমসাময়িক ফকিহ আলেমগণ একে বৈধ বলে ফতোয়া দিয়েছেন।[৯] তাদের ফতোয়ার ভিত্তি হলো, তা পারিশ্রমিকের বিনিময়ের আমানত, যাতে জামানতের শর্ত রয়েছে। কিন্তু হানাফী ফকিহগণ পারিশ্রমিক ভিত্তিক আমানত

---

৮. sub-section (2) Gives statutory recognition to the important rule that, where goods are delivered to a carrier or the like for transmission to a buyer, the carrier is presumed to be the buyer's agent, not only to take delivery, but to assent to the appropriation to contract of the goods so delivered, subject of course to any just ground of exception, which may subsequently be discovered. (Pollock and Mulla : On the sale of goods act. sac : 23, P : 203.)

৯. فتاوى رشيدية للإمام رشيد أحمد الكنكوهيّ رحمه الله تعالى صـ٤١٠ وجواهر الفقه للشيخ المفتي محمد شفيع رحمه الله تعالى ٤: ٤٦٩

বা (اجير مشترك) কাজকেন্দ্রিক সেবাদানকারীর ক্ষেত্রে বলে থাকেন যে, যদি দুর্ঘটনা এমন হয় যে, তা থেকে বাঁচা সম্ভব, তা হলে তো উক্ত জিনিস নষ্ট হলে জরিমানা দিতে হবে।[১০] আর যদি এমন হয় যে, সেই দুর্ঘটনা থেকে সাধারণত বাঁচা সম্ভবই নয় তা হলে اجير مشترك কে জরিমানা দিতে হবে না।

আল্লামা ইবনুল আবেদিন শামী রহ. বলেন,

> وكل من المودع والاجير المشترك لا يضمن مالا يمكن الاحتراز عنه، كالموت والغرق ونحو ذلك،
>
> আমানতগ্রহণকারী ও কর্মকেন্দ্রিক সেবাদানকারী এমন দুর্ঘটনার কারণে জামিন হবে না, যা থেকে বাঁচা সম্ভব নয়। যেমন : মৃত্যু ঘটে যাওয়া, ডুবে যাওয়া ইত্যাদি।[১১]

সম্ভবত এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আইনের পরিভাষায় বর্তমানে যাকে الظروف القاهرة (Force Majure) বলে। কেননা এমন অবস্থায় জামিন হয় না।

পঞ্চম মাসআলা :

ডাকবিভাগ পণ্যমূল্যের আমানতদার হবে নাকি জামিন হবে?

এর উত্তর হলো, ডাকবিভাগের প্রতিনিধি যখন পণ্যমূল্য ক্যাশ আকারে গ্রহণ করবে তখন সে সুনির্দিষ্ট ওই মুদ্রা বিক্রেতার নিকট হস্তান্তর করে না। বরং ডাক কর্তৃপক্ষ অন্যান্য মানুষের প্রদেয় টাকার সাথে এ টাকা মিলিয়ে ফেলে। তারপর বিক্রেতার নিকট এ টাকার সমপরিমাণ টাকা পৌছে দেয়। ফলে এ টাকা জামানতকৃত ঋণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আর এ কারণেই উক্ত টাকা ডাকবিভাগের জামানতে চলে যায়। অতএব মানি অর্ডার (Money Order) পদ্ধতিতে টাকা পাঠাবার ব্যাপারে যা আলোচনা হয়েছে, এক্ষেত্রে সে সবকিছু প্রযোজ্য হবে।

ডাকবিভাগ পণ্যমূল্যগ্রহণের কারণে ক্রেতার নিকট ঋণী সাব্যস্ত হলো। এখন ক্রেতা উক্ত টাকা অন্য শহরে অবস্থিত বিক্রেতার নিকট পৌছে দেওয়ার

---

١٠ وتضمين الأجير المشترك فيما وقع بغير فعل الأجير مذهب أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى، وقد اختاره المتأخرون للفتوى، ومذهب غيرهما أنه لايضمن. (راجع ردالمحتار، باب ضمان الأجير٦: ٦٥ والمغنى لابن قدامة ٦: ١٠٧ و ١٠٨)

১১. রদ্দুল মুহতার, ১২/৬৪৩।

নির্দেশ করল বিধায় ডাকবিভাগ এই কাজের বিনিময় নিতে পারবে। এই ফি তাদের কাজের পারিশ্রমিক। যেমনটি আমরা ডাকমারফত টাকা পাঠাবার অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

ব্যাংকের মধ্যস্থতায় বৈদেশিক বাণিজ্য

বৈদেশিক বাণিজ্যে ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে মধ্যস্থতার দ্বিতীয় মাধ্যম হলো ব্যাংক। আর এই মধ্যস্থতা প্রমাণপত্র (Documentary Credit) জারি করার মাধ্যমে হয়ে থাকে। শুরুতে আমরা প্রমাণপত্র Documentary Credit ও তার মাধ্যমে ব্যবসাবাণিজ্যের পদ্ধতি নিয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করব। তারপর ইনশাআল্লাহ এগুলোর ফিকহি বিশ্লেষণ সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পাব। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সঠিক বিশ্লেষণের তাওফিক দান করুন। আমিন।

মূলত এই মধ্যস্থতার সারকথা হলো, যখন কেউ বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করতে চায় তখন পণ্য হস্তান্তর ও মূল্য সমর্পণ কোনোটাই ক্রেতা-বিক্রেতা সরাসরি করতে পারে না। কেননা, আন্তর্দেশীয় বাণিজ্য ও দূরবর্তী শহরের ব্যবসাবাণিজ্যের প্রচলিত পদ্ধতি হলো, বিক্রেতা শিপের মাধ্যমে অথবা এয়ারকার্গো বা স্থলকার্গো-যোগে পণ্য পাঠাবে। কার্গো কোম্পানি পণ্যপ্রাপ্তির রশিদ জারি করবে, যে রশিদ একথার প্রমাণ বহন করবে যে, বিক্রীত পণ্য কার্গো কোম্পানির নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

এই ডকুমেন্টকে আরবিভাষায় بوليصة الشحن আর ইংরেজিভাষায় Bill of Lading (বিএল) বলে।[১২]

---

১২. বিল অব লেডিং (বিএল)

পণ্যরপ্তানির ক্ষেত্রে বিল অব লেডিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এতে পণ্যের বিবরণ, নিট ওয়েট, মোট পরিমাণ, পণ্য বোঝাইয়ের বন্দর, পণ্য খালাসের বন্দর, রপ্তানিকারক এবং আমদানিকারকের নাম, নোটিফাইং পক্ষের নাম-ঠিকানা ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে সন্নিবেশিত থাকে। শিপিং কোম্পানির অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক তা স্বাক্ষরিত থাকে। আকাশপথে পণ্য পাঠালে বিমানের ডকুমেন্টকে 'এয়ার ওয়ে বিল' বলে।

রপ্তানিকারক শিপিং কোম্পানি থেকে বিএল উসুল করে তা অ্যাডভাইজিং ব্যাংককে হস্তান্তর করে। ব্যাংক তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে যে, তা এলসির শর্ত মোতাবেক কি না? যদি শর্ত মোতাবেক হয়, তা হলে অন্যান্য ডকুমেন্টসহ আমদানিকারকের ব্যাংকের নিকট পাঠিয়ে দেয়।

এই ডকুমেন্টে জাহাজিকৃত পণ্যের প্রকার, পরিমাণ ও গুণগত মান উল্লেখ থাকে। বিক্রেতা এই ডকুমেন্ট (বিএল) ক্রেতার নিকট পাঠিয়ে দেয়, যাতে করে পণ্য বন্দরে পৌঁছার পর তা দেখিয়ে কার্গো কোম্পানির প্রতিনিধি থেকে মাল বুঝে নিতে পারে। কার্গোপ্রতিনিধিগণ বিএল দেখে ক্রেতার নিকট মাল হস্তান্তর করে দেয়।

এখন কথা হলো, যদি ক্রেতা-বিক্রেতার নিকট শুরুতেই পণ্যমূল্য পাঠিয়ে দেয়, তা হলে ক্রেতা এ নিশ্চয়তা পায় না যে, বিক্রেতা কাঙ্ক্ষিত গুণসম্পন্ন পণ্য যথাসময়ে তার নিকটে পাঠাবে। অনুরূপ যদি বিক্রেতা ক্রেতার নিকট শুরুতেই পণ্য পাঠিয়ে দেয় তা হলে সেও আশ্বস্ত হতে পারে না যে, ক্রেতা যথাসময়ে পণ্যমূল্য পাঠাবে।

মূলত এ সমস্যার সমাধানকল্পে ব্যাংক উভয়ের মাঝে মধ্যস্থতার দায়িত্ব পালন করে থাকে।[১৩] বিক্রেতা ক্রেতার উপর এ শর্তারোপ করে যে, সে কার্গো

অন্যান্য ডকুমেন্টস

বিল অব এক্সচেঞ্জ বা ড্রাফট, ইনভয়েস (ইনভয়েস রপ্তানিকারক কর্তৃক প্রণীত হয়ে থাকে; এতে পণ্যের বিবরণ, মূল্য, পরিমাণ, গুণগত মান, প্যাকেট সংখ্যা, পণ্যের গ্রেড, এলসি নম্বর, চুক্তিনামার শিপমেন্টের তারিখ ইত্যাদি উল্লেখ থাকে), সামুদ্রিক বিমা পলিসি ইত্যাদি। এগুলো প্রায় সব রপ্তানিতেই আবশ্যক দলিল হিসাবে গণ্য করা হয়। এ ছাড়া কিছু সহায়ক দলিল রপ্তানিকারককে প্রস্তুত করতে হয়। যেমন : প্যাকিং লিস্ট, ইন্সপেকশন সার্টিফিকেট, কোয়ালিটি কন্ট্রোল সার্টিফিকেট ইত্যাদি। —অনুবাদক।

১৩. **বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যাংক-কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ**

আমদানিকারকের জন্য ব্যাংক তিনটি কাজ করে :

১. **প্রতিনিধিত্বকরণ (Agency) :** অর্থাৎ ব্যাংক আমদানিকারকের প্রতিনিধি হয়ে রপ্তানি-কারকের সাথে লেনদেন কার্যক্রম পরিচালনা করে। আমদানিকারকের ডকুমেন্টস রপ্তানিকারকের নিকট পাঠায়। রপ্তানিকারক কর্তৃক প্রেরিত ডকুমেন্টস আমদানি-কারকের নিকট হস্তান্তর করে। এসব কাজের বিনিময়ে ব্যাংক পারিশ্রমিক নিয়ে থাকে।

২. **নিশ্চয়তা প্রদান (Guarantee) :** অর্থাৎ ব্যাংক এ বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, যদি ক্রেতা মূল্য পরিশোধ না করে তা হলে ব্যাংক মূল্য পরিশোধ করবে। এ গ্যারান্টি প্রদানের বিনিময়ে ব্যাংক পারিশ্রমিক নিয়ে থাকে।

৩. **ঋণসুবিধা প্রদান (Credit) :** অর্থাৎ আমদানিকারক যদি সময়মতো মূল্য পরিশোধ না করে (সাইট পেমেন্ট এলসি হলে) তখন ব্যাংক তা পরিশোধ করে দেয়। ব্যাংকপ্রদত্ত এ অর্থ আমদানিকারকের দায়ে ঋণ সাব্যস্ত হয়। এ অর্থের উপর ব্যাংক আমদানিকারক থেকে সুদ উসুল করে। এক্ষেত্রে ঋণ দু'ধরনের হতে পারে। কখনও

তা নিয়মতান্ত্রিক-ভাবেই ব্যাংক হতে ঋণ নেওয়া হয়; যখন ব্যাংকের সাথে এই মর্মে চুক্তি হয় যে, সময়মতো ব্যাংকই মূল্য পরিশোধ করবে। আমদানিকারক নির্দিষ্ট সময়ের পর ব্যাংককে তা পরিশোধ করে দেবে। মূলত ব্যাংকের সাথে আমদানিকারকের এটি একটি পৃথক চুক্তি। এর সাথে এলসি ফিয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। আমদানিকারকের অনুকূলে এই ঋণ প্রদানের কারণে ব্যাংক নিয়মতান্ত্রিক হারে সুদ নিয়ে থাকে। তবে কখনও নিয়মতান্ত্রিকভাবে ঋণ নেওয়া হয় না, কিন্তু স্বয়ংক্রিয়ভাবেই এলসি আবেদনকারী ব্যক্তির উপর ব্যাংকের ঋণ চেপে যায়। তা এভাবে যে, কখনও তো এলসি খোলার সময় পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে দেওয়া হয়, যাকে 'শতভাগ মার্জিনে এলসি খোলা' বলে। আবার কখনও এলসি খোলার সময় আংশিক পরিশোধ করা হয়। যেমন : ২৫% পরিশোধ করে এলসি খোলা হলো; যাকে '২৫% মার্জিনে এলসি খোলা' বলে। আবার কখনও এলসি খোলার সময় কোনো টাকাই পরিশোধ করা হয় না, যাকে 'জিরো মার্জিনে এলসি খোলা' বলে। এসব অবস্থায় অর্থাৎ, জিরো মার্জিন বা আংশিক মার্জিনে এলসি খোলা হলে ডকুমেন্টস ব্যাংকের নিকট পৌঁছলেই ব্যাংক মূল্য পরিশোধ করে দেয়। যদি ডকুমেন্টসের বিবরণ এলসির শর্তানুযায়ী হয় এবং কোনো অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত না হয়। কিন্তু আমদানিকারকের পক্ষ থেকে মূল্য পরিশোধে কিছুটা বিলম্ব হয়ে যায়—যেমন : ব্যাংক আমদানিকারকের সাথে যোগাযোগ করতে দেরি করল আর একারণে মূল্য পরিশোধে বিলম্ব হলো; তো এ ধরনের পরিস্থিতিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই কয়েকদিনের জন্য আমদানিকারকের দায়ে ঋণ চেপে যায়। এধরনের ঋণের উপর ব্যাংক সুদ উসুল করে থাকে।

রপ্তানিকারকের অনুকূলে ব্যাংকিং কার্যক্রম

অন্যদিকে রপ্তানিকারকের ব্যাংক কোনো জিনিসের গ্যারান্টি প্রদান করে না। এ ব্যাংক কেবল দুটি কাজ করে থাকে। তবে এই দুই কাজের বিনিময় ব্যাংক নিয়ে থাকে।

১. **প্রতিনিধিত্বকরণ :** অর্থাৎ রপ্তানিকারকের প্রতিনিধি হয়ে রপ্তানিকার্যক্রম পরিচালনায় সহযোগিতা করা।

২. **ঋণ :** যদি আমদানিকারকের সাথে রপ্তানিকারকের চুক্তি এরূপ হয় যে, বিএল হাতে পৌঁছার সাথে সাথেই আমদানিকারক মূল্য পরিশোধ করে দেবে। ব্যাংকিং পরিভাষায় এ পদ্ধতিকে (L/C at Sight) এলসি এট সাইট বলে। এ পদ্ধতিতে রপ্তানিকারককে ঋণ দিতে হয় না। কিন্তু যখন চুক্তি এরূপ হয় যে, বিএল পৌঁছার অনেকদিন (যেমন : ৩০ দিন) পর আমদানিকারক মূল্য পরিশোধ করবে। এক্ষেত্রে যদি রপ্তানিকারকের ব্যাংক তাৎক্ষণিক ব্যবসায়ীকে মূল্য দিয়ে দেয় তা হলে এই টাকা রপ্তানিকারকের দায়ে ঋণ গণ্য হবে।

আর যদি আমদানিকারকের নিকট আমদানির জন্য অর্থ না থাকে অথবা টাকা থাকলেও সে টাকা আমদানির কাজে ব্যবহার করতে না চায়, তখন আমদানিকারক ব্যাংক থেকে

কোম্পানির নিকট পণ্য তখনই হস্তান্তর করবে—শিপিং কোম্পানি হোক কিংবা এয়ারকার্গো বা স্থলকার্গো—যখন ক্রেতা কোনো ব্যাংক থেকে এই গ্যারান্টিপত্র পাঠাবে যে, 'কার্গো-ডকুমেন্ট' পৌঁছার সাথে সাথেই ব্যাংক তার নিকট পণ্যমূল্য পাঠিয়ে দেবে। এজন্যই ক্রেতা তার শহরে অবস্থিত কোনো ব্যাংকের শরণাপন্ন হয়ে বিক্রেতার অনুকূলে গ্যারান্টিপত্র খুলে থাকে। ব্যাংক তাতে দায়ভার গ্রহণ করে এবং নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, ডকুমেন্টে উল্লেখিত গুণগত মানসম্পন্ন 'কার্গো-ডকুমেন্ট' পেলে ব্যাংক কাঙ্ক্ষিত মূল্য পাঠিয়ে দেবে। বিক্রেতার শহরে অবস্থিত বিক্রেতা কর্তৃক মনোনীত ব্যাংকে তার বরাবর ব্যাংক এ মূল্য পাঠাবে।

এই গ্যারান্টিপত্রকে خطاب الاعتماد (Letar of Credit) বলে। সংক্ষেপে LC এলসি বলে।

ক্রেতা কর্তৃক এলসি খোলার আবেদনকে فتح الاعتماد (Opening the Letar of Credit) বলে। ব্যাংক সাধারণত এ গ্যারান্টিপত্র প্রদানের উপর ক্রেতার থেকে ফি নিয়ে থাকে।

এ কার্যক্রমে ব্যাংকের নিকট এলসি আবেদনকারী ক্রেতাকে طالب فتح الاعتماد 'এলসি আবেদনকারী' বলে। আর বিক্রেতা তথা রপ্তানিকারককে المستفيد বা Beneficiary (বেনিফিশিয়ারি) বলে। আর যে ব্যাংক এলসি ইস্যু করে তাকে البنك المصدر Issuing Bank (ইস্যুয়িং ব্যাংক) বলে।

আবার কখনও ইস্যুয়িং ব্যাংক রপ্তানিকারকের শহরে অবস্থিত কোনো ব্যাংককে বিক্রেতার নিকট মূল্য পরিশোধের প্রতিনিধি নিয়োগ করে থাকে, যাকে البنك

ঋণ নিয়ে আমদানিকার্য সমাধা করে। আমদানির কাজে ব্যাংক যে ঋণ দিয়ে থাকে, একে আরবিভাষায় تمويل الواردات বলে। ইংরেজি ভাষায় Import Financing বলে। অনুরূপ রপ্তানি কাজে ব্যাংক হতে যে ঋণ সংগ্রহ করা হয় অর্থাৎ কোনো ব্যবসায়ীর নিকট ভিনদেশি কোনো ব্যবসায়ীর পক্ষ থেকে পণ্য ক্রয়ের অর্ডার রয়েছে কিন্তু পণ্য তৈরী বা সরবরাহের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তা উক্ত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত নেই, তখন সে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে কাঙ্ক্ষিত পণ্য সংগ্রহ করে তা রপ্তানি করে। এক্ষেত্রে ব্যাংক রপ্তানিকাজের জন্য যে অর্থায়ন করে একে আরবিভাষায় تمويل الصادرات বলে আর ইংরেজি ভাষায় Export Financing বলে। সব রাষ্ট্রই রপ্তানিবাণিজ্যকে উৎসাহিত করে থাকে। রপ্তানিখাতে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ঋণগ্রহীতাকে বিভিন্ন ধরনের ছাড় ও সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে। কেননা রপ্তানিবাণিজ্যের ফলে বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আসে, রেমিট্যান্স বৃদ্ধি পায়। —অনুবাদক।

المراسل Corresponding bank or advising bank বলে। সংক্ষেপে অ্যাডভাইজিং ব্যাংক বলে।[১৪]

---

১৪. ঋণপত্র খোলা (L/C Opening)

আমদানিকারকের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের উদ্দেশ্যে রপ্তানিকারকের অনুকূলে ব্যাংক ঋণপত্র খুলে থাকে। আমদানিকারক (আবেদনকারী) প্রাথমিকভাবে তার নিজস্ব লেটারপ্যাডে লিখিতভাবে তার মনোনীত ব্যাংকের নিকট এলসি খোলার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। পরিবহণের সকল ঝুঁকি ও পণ্যমূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা দিয়ে স্থানীয় ব্যাংকে এলসি খোলার আবেদন করে। ব্যাংক সংশ্লিষ্ট বিষয় যাচাই-বাছাই করে এলসি খুলে দেয় এবং রপ্তানিকারকের ব্যাংকে ডকুমেন্ট পাঠিয়ে দেয়। এলসির কারণে আমদানিকারক পণ্যমূল্য পরিশোধ করতে অস্বীকার করলে ব্যাংক পণ্যমূল্য পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে। ব্যাংকের এই প্রতিশ্রুতির উপর ভিত্তি করেই রপ্তানিকারক আমদানিকারকের নিকট পণ্য প্রেরণ করে থাকে। এলসির মাধ্যমে রপ্তানিকারক তার পণ্যের মূল্যপ্রাপ্তি সম্পর্কে যেমন নিশ্চিত হতে পারে, তেমনি আমদানিকারকও এলসির বিপরীতে সুদি ব্যাংক হতে ঋণসুবিধা পেয়ে থাকে। তা ছাড়া পণ্যপ্রাপ্তির পর রপ্তানিকারক পণ্যমূল্য ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করতে পারে।

ঋণপত্রের পক্ষসমূহ

১. আমদানিকারক/বায়ার/আবেদনকারী। ব্যাংকের নিকট যিনি এলসি খোলার আবেদন করে থাকেন।

২. রপ্তানিকারক/সেলার/বেনিফিশিয়ারি। এলসির বেনিফিশিয়ারি হলো যার অনুকূলে এলসি খোলা হয়। সাধারণত বিক্রেতা-রপ্তানিকারক হলো বেনিফিশিয়ারি।

৩. ইস্যুয়িং ব্যাংক/ওপেনিং ব্যাংক। যে ব্যাংক আবেদনকারীর অনুরোধে এলসি খোলে, সে ব্যাংককে 'ইস্যুয়িং ব্যাংক' এবং 'ওপেনিং ব্যাংক' বলে। এলসির শর্তানুযায়ী ডকুমেন্ট উপস্থাপন করা হলে ইস্যুয়িং ব্যাংক বিল পরিশোধ করতে বাধ্য।

৪. অ্যাডভাইজিং ব্যাংক/নোটিফাইয়িং ব্যাংক। যে ব্যাংকের মাধ্যমে এলসি রপ্তানিকারকের নিকট অ্যাডভাইস করা হয় সে ব্যাংককে 'অ্যাডভাইসিং ব্যাংক' এবং 'নোটিফায়িং ব্যাংক' বলে। অ্যাডভাইজিং ব্যাংক ইস্যুয়িং ব্যাংকের এজেন্ট হিসাবে কাজ করে। এ ব্যাংক ডকুমেন্টস নেগোসিয়েট করে এবং বিক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করে। এজন্য এ ব্যাংককে 'নেগোসিয়েটিং ব্যাংক'ও বলে।

এলসির প্রকারভেদ

এলসি সাধারণত দু'ধরনের হয়ে থাকে :

১. **রিভোকেবল লেটার অব ক্রেডিট (Revocable Letter of Credit) :** পণ্য জাহাজিকরণের পূর্বে রিভোকেবল এলসি যেকোনো সময় বাতিল করা যায়। পূর্ব নোটিশ ছাড়াই ইস্যুয়িং ব্যাংক তা সংশোধন/বাতিল করতে পারে।

এক্ষেত্রে বিক্রেতা সাধারণত এ ব্যাংকের উপর কোনো দাবি উত্থাপন করে না, মামলা-মোকদ্দমা করে না। কেননা, সে রপ্তানিকারকের ব্যাংকের প্রতিনিধি-

---

২. ইরিভোকেবল লেটার অব ক্রেডিট (Irrevocable letter of credet) : এ ধরনের ঋণপত্র উভয়পক্ষের সম্মতি ব্যতীত কোনো ধরনের সংশোধন বা বাতিল করা যায় না। এক্ষেত্রে ইস্যুয়িং ব্যাংক ডকুমেন্ট গ্রহণ ও বিল পরিশোধে বাধ্য থাকে।

পরিশোধ হিসাবে এলসি দু'প্রকার

ক. সাইট পেমেন্ট : এলসি অনুযায়ী কাগজপত্র আসার সাথে সাথেই যদি পণ্যমূল্য পরিশোধ আবশ্যক হয় এবং বিলম্বে পরিশোধের শর্ত না থাকে। তা হলে তাকে সাইট পেমেন্ট বলে অর্থাৎ সাইট ড্রাফটে ডকুমেন্টস উপস্থাপন করা হলে ইস্যুয়িং ব্যাংক বিল পরিশোধ করতে বাধ্য থাকে।

খ. ডেফার্ড পেমেন্ট : ঋণপত্রের শর্তানুসারে ডেফার্ড পেমেন্ট অর্থ বিলম্বে পরিশোধ। এ ধরনের এলসিতে সুনির্দিষ্ট সময় উল্লেখ থাকে এবং নির্ধারিত সময়ে তা পরিশোধ করতে হয়। ডকুমেন্টস উপস্থাপনের পর নির্দিষ্ট সময়ান্তে পণ্যমূল্য পরিশোধিত হয়।

ব্যাক টু ব্যাক এলসি (Back to Back L/C)

ব্যাক টু ব্যাক এলসি মানে একটি এলসির বিপরীতে আরেকটি এলসি। কোনো রপ্তানিকারক যখন রপ্তানির জন্য আমদানিকারকের পক্ষ থেকে এলসি পেয়ে থাকেন, তখন উক্ত এলসিকে জামানত রেখে যে আমদানিএলসি খোলা হয় সে এলসিকে 'ব্যাক টু ব্যাক এলসি' বলে। মূলত রপ্তানিকারকের নিকট যখন প্রয়োজনীয় মূলধন থাকে না, তখন রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহের জন্য রপ্তানি এলসি (মাস্টার এলসি) জমা দিয়ে অ্যাডভাইজিং ব্যাংক বা তার দেশীয় কোনো ব্যাংক রপ্তানিকারকের অনুকূলে একটি আমদানিএলসি খুলে থাকে। প্রথম এলসির প্রায় সব শর্ত অবিকল অবস্থায় ব্যাক টু ব্যাক এলসিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে মাস্টার এলসি হতে এ এলসির পণ্যমূল্য কম থাকতে হয়। আমাদের দেশের রপ্তানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠান, যাদের বৈধ বন্ডেড ওয়ার হাউজ লাইসেন্স (Bonded Warehouse Licens) আছে কেবল তারাই ব্যাংক টু ব্যাংক এলসি খুলতে পারে।

[কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বন্ডেড ওয়ার হাউজ লাইসেন্স থাকলে সংশ্লিষ্ট শিল্পের জন্য আমদানিকৃত কাঁচামাল খালাসপর্যায়ে শুল্ক আদায় ব্যতিরেকে একটি আইনানুগ বন্ড গ্রহণ করে পণ্য খালাস দেওয়া হয়]।

সাধারণত রপ্তানি এলসির বিপরীতে Usance ব্যাক টু ব্যাক এলসিই খোলা হয়। তবে EDFS (Export Development Fund Scheme)-এর অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে অর্থায়নের ব্যবস্থা করে এট সাইট ব্যাক টু ব্যাক এলসিও খোলা যায়। দেশের রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এ ঋণসহায়তা করে থাকে। আমাদের দেশের রপ্তানিমুখী তৈরী পোশাকশিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাক টু ব্যাক এলসির মাধ্যমে পোশাক তৈরীর যাবতীয় উপকরণ বিদেশ থেকে আমদানি করে থাকে। —অনুবাদক।

হবে। ইস্যুয়িং ব্যাংকের প্রতিনিধি হয়ে সে মূল্য পরিশোধ করে থাকে। এই ব্যাংক রপ্তানিকারকের অনুকূলে গ্যারান্টি প্রদানকারী নয়। তবে প্রয়োজনে বা রপ্তানিকারকের পক্ষ থেকে দাবি উঠলে এ ব্যাংক জারিকৃত এলসি সত্যায়ন করে থাকে। আর যখন স্পষ্টত তা সত্যায়ন করবে তখন এ ব্যাংকও ইস্যুয়িং ব্যাংকের সাথে দায়গ্রহণে যুক্ত হবে। তখন রপ্তানিকারক ইচ্ছা করলে এ ব্যাংক থেকেও এলসিমূল্য দাবি করতে পারবে। তাই স্পষ্টত দায়গ্রহণে যুক্ত হলে এই ব্যাংককে البنك المعزز বা Confirming Bank (কনফার্মিং ব্যাংক) বলা হবে।

ইস্যুয়িং ব্যাংক এলসি খোলার দ্বারা এই দায়ভার গ্রহণ করে থাকে যে, যখন সে বিএল (পণ্য জাহাজিকরণ বিল) পেয়ে যাবে, তখন সে তা যাচাই-বাছাই করে দেখবে, বিএল এলসিতে উল্লেখিত শর্ত মোতাবেক কি না। মালের গুণগত মান বা অন্যকোনো বিষয়ে বিএল এলসির পরিপন্থী নয় তো? যদি বিএল এলসির সাথে পূর্ণ শর্ত মোতাবেক হয়, তা হলে ব্যাংক শর্ত মোতাবেক বেনিফিশিয়ারিকে এলসিমূল্য আদায় করে দেবে।

উল্লেখ্য যে, এখানে ইস্যুয়িং ব্যাংকের দায়িত্ব কেবল বিএল-কে এলসির সাথে মিলিয়ে দেখা। পণ্যের মান যাচাই-বাছাই বা বিক্রয়চুক্তিতে উল্লেখিত শর্তগুলো বাস্তবেই পণ্যে বিদ্যমান আছে কি না? তা যাচাইয়ের দায়িত্ব ব্যাংকের নয়।

অনুরূপ বাস্তবে তা পাওয়া না গেলে ব্যাংকের উপর তার কোনো দায়ভারও চাপবে না। ব্যাংকের কাজ হলো শুধু ডকুমেন্ট যাচাই করা।

বিক্রেতা যখন পণ্য কার্গো কোম্পানিকে অর্পণ করে, তখন কার্গো কোম্পানি بوليصة الشحن তথা বিএল (বিল অব লেডিং) জারি করে; তাতে এই পণ্যের প্রকার, পরিমাণ ও মান উল্লেখ থাকে। বিএলে উল্লেখিত মান বিক্রয়চুক্তিতে উল্লেখিত শর্ত ও মান অনুযায়ী হতে হয়। ক্রেতা যখন ইস্যুয়িং ব্যাংকের নিকট এলসি খোলে তখন সে বিক্রয়চুক্তিতে উল্লেখিত সকল শর্ত ও মান এলসিতে উল্লেখ করে দেয়। সুতরাং যদি বিএলে উল্লেখিত মান এলসিতে মুদ্রিত শর্তের সাথে মিলে যায় তা হলে ব্যাংক এলসিতে উল্লেখিত মূল্য প্রদানে বাধ্য থাকবে।

তবে যদি ক্রেতা পণ্য হস্তগত করার পর তা বিক্রয়চুক্তিতে উল্লেখিত শর্ত অনুযায়ী না পায় কিংবা তাতে কোনো ধোঁকা-প্রতারণা পরিলক্ষিত হয়, তা

হলে ক্রেতা নিজেই বিক্রেতার শরণাপন্ন হবে। এলসি ইস্যুকারী ব্যাংক বিক্রেতার শরণাপন্ন হবে না।

অনুরূপ এলসি ইস্যুকারী ব্যাংক পণ্যমূল্য প্রদানে বাধ্য থাকবে; ক্রেতা পণ্যমূল্য পূর্বেই তাকে প্রদান করুক বা না করুক। বিক্রেতা সকল অবস্থায় তা ব্যাংকের নিকট দাবি করবে, ক্রেতা বা আমদানিকারকের নিকট নয়। তবে হ্যাঁ, ব্যাংক বিক্রেতার নিকট পণ্যমূল্য পাঠিয়ে দিয়ে ক্রেতা থেকে তা উসুল করে নেবে।

এই প্রক্রিয়ায় ব্যাংক স্বভাবত নিশ্চিত থাকে যে, ক্রেতা, যিনি এলসি খুলেছেন, তিনি এলসিমূল্য অবশ্যই ব্যাংককে আদায় করে দেবেন। ক্রেতা কখনও এলসি খোলার সময়ই পণ্যমূল্য আদায় করে দেয়, আবার কখনও কিয়দংশ আদায় করে এলসি খুলে থাকে।

এলসি খোলার সময় ক্রেতা কর্তৃক ব্যাংককে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয় একে আরবিভাষায় غطاء এবং ইংরেজিভাষায় Margin (মার্জিন) বলে। যদি এলসি খোলার সময়ই পূর্ণ মূল্য আদায় করে দেওয়া হয়, তা হলে এই এলসিকে مغطى بالكامل (with full Margin) 'ফুল মার্জিন এলসি' বলে। আর যদি পণ্যমূল্য আংশিক প্রদান করে এলসি খোলা হয় তা হলে একে مغطى جزئيا (with Partial Margin) 'পার্শিয়াল মার্জিন' বা 'আংশিক মার্জিন' এলসি বলে।

আর যদি পূর্ব লেনদেনের কারণে ক্রেতা ব্যাংকের নিকট আস্থাশীল হয়, তা হলে কোনো মূল্য প্রদান ছাড়াই ব্যাংক এলসি খুলে দেয়। কেননা, ব্যাংক নিশ্চিত যে, গ্রাহক বিএল হস্তগত করার সময় অবশ্যই পণ্যমূল্য পরিশোধ করে দেবে। এমন হলে এই এলসিকে غير مغطى বা بدون غطاء Without Margin বা 'জিরো মার্জিন এলসি' বলে।

তবে এই অবস্থায় পণ্য ব্যাংকের নিকট বন্ধক থাকে। কেননা, জাহাজিকরণ ডকুমেন্টগুলো ব্যাংকের নামেই ইস্যু হয়। আর আইনত ব্যাংকের এ অধিকার আছে যে, যদি ক্রেতা তার নিকট মূল্য পরিশোধ না করে তা হলে সে নিজেই পণ্য বন্দর থেকে খালাস করিয়ে নেবে এবং বাজারে তা বিক্রি করে দেবে। এভাবে সে রপ্তানিকারকের নিকট এলসিভিত্তিক প্রেরিত অর্থ উসুল করে নেবে।

তারপর যদি ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে নগদ চুক্তি হয়, অর্থাৎ বিএল হস্তগত হওয়ার সাথে সাথেই ক্রেতার উপর পণ্যমূল্য পরিশোধ আবশ্যক হয়, তা হলে এই প্রকৃতির এলসিকে خطاب اعتماد بالاطلاع (Sight L/C) 'সাইট এলসি' বলে। এমন এলসিতে বিএল ইত্যাদি ডকুমেন্ট হস্তগত হওয়ার সাথে সাথেই ব্যাংক কর্তৃক পণ্যমূল্য পরিশোধ আবশ্যক হয়ে যায় (যদি ডকুমেন্ট এলসির শর্ত অনুযায়ী হয়)।

আর যদি ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে নগদ বিক্রি না হয়ে বাকি বিক্রি হয়, তা হলে এলসিতেই মূল্য পরিশোধের তারিখ উল্লেখ থাকতে হয়। এক্ষেত্রে ক্রেতা ডকুমেন্ট ইত্যাদি বুঝে নেওয়ার পর রপ্তানিকারকের পক্ষ থেকে পাঠানো বিলে (Bill) এই মর্মে দস্তখত করে দেয় যে, সে তা গ্রহণ করেছে এবং বিলে উল্লেখিত মূল্য এলসিতে উল্লেখিত তারিখে পরিশোধ করতে সে বাধ্য থাকবে।

তা হলে ক্রেতাকর্তৃক স্বাক্ষরিত এই বিলকে পরিভাষায় كمبيالة (Bill of Exchange) বিল অব এক্সচেঞ্জ বলে।

যদি এধরনের বাকি বিক্রি হয়, তা হলে ডকুমেন্ট হস্তগত হওয়ার সাথে সাথে ব্যাংক এলসিমূল্য পরিশোধ করবে না। তবে অবশ্যই বিল অব এক্সচেঞ্জে স্বাক্ষর নেওয়ার পর ক্রেতার নিকট বিএল ও অন্যান্য ডকুমেন্ট হস্তান্তর করবে, যাতে সে তা দেখিয়ে বন্দর থেকে মাল খালাস করতে পারে। ব্যাংক এলসিতে উল্লেখিত তারিখেই বিক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করবে। উল্লেখিত তারিখের সময় হওয়াকে পরিভাষায় نضج الكمبيالة (Maturity of the bill) 'বিলের মেয়াদপূর্তি' বলে। বিলের এই মেয়াদপূর্তির সময় ব্যাংক এলসিমূল্য রপ্তানিকারকের নিকট পাঠিয়ে দেয় এবং পরবর্তী সময়ে তা ক্রেতা থেকে উসুল করে নেয়। এই প্রকৃতির এলসিকে الاعتماد المؤجل usance L/C এলসি বলে।

এই প্রক্রিয়ায় কখনও এমনও হয় যে, বিক্রেতা বিল অব এক্সচেঞ্জের মেয়াদ-পূর্তির অপেক্ষা করে না। বরং সে তাৎক্ষণিক পণ্যমূল্য পেতে চায়, যাতে করে সে অর্থ অন্যান্য কাজে লাগাতে পারে। তখন সে এই বিল অব এক্সচেঞ্জ কোনো ব্যাংকের নিকট পেশ করে, তা ইস্যুয়িং ব্যাংক হোক বা অ্যাডভাইজিং ব্যাংক বা অন্যকোনো ব্যাংক। আর তখন সে বিল অব এক্সচেঞ্জের অপর পৃষ্ঠে মালিকানা হস্তান্তর নিমিত্তে স্বাক্ষর করে দেয়, যাতে করে ব্যাংক মেয়াদপূর্তির

সময় ইস্যুয়িং ব্যাংক বা ক্রেতা থেকে (যদি এলসিবিহীন চুক্তি হয়ে থাকে) বিলে উল্লেখিত মূল্য উসুল করে নিতে পারে।

ক্রেতার এই স্বাক্ষর, যা মালিকানা হস্তান্তরের জন্য হয়ে থাকে, একে تظهير Endrosement 'এনড্রোসমেন্ট' (পৃষ্ঠাঙ্কন) বলে। এমন এনড্রোসমেন্টকৃত বিল অব এক্সচেঞ্জ বুঝে নেওয়ার পর ব্যাংক বিল অব এক্সচেঞ্জের মূল্য কিছুটা কমিয়ে বিক্রেতাকে পরিশোধ করে দেয়।

উদাহরণস্বরূপ, যদি ১০০ ডলারের বিল হয় তা হলে ৯৯ ডলার প্রদান করবে। এ বিল বাট্টাকরণকে সাধারণ পরিভাষায় حسم الكمبيالة বা خصم الكمبيالة বলে। আর ইংরেজিভাষায় একে Discounting of the Bill 'ডিসকাউন্টিং অব দ্যা বিল' বলে। আমরা بيع الدين অধ্যায়ে আলোচনা করেছি যে, এই কার্যক্রম সুদনির্ভর, যা শরিয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ।

অপরদিকে ক্রেতা কখনও ঋণ নিয়ে মূল্য পরিশোধ করার ইচ্ছা করে। তখন সে ইস্যুয়িং ব্যাংকের সাথে এভাবে চুক্তি করে যে, ব্যাংকই তাকে ঋণ দেবে। অর্থাৎ ব্যাংক যথানিয়মে নির্ধারিত সময়ে বিক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করে দেবে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ক্রেতা থেকে তা উসুল করে নেবে। এমন হলে নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে ব্যাংক ক্রেতার নিকট তা চাইবে না। তবে নির্দিষ্ট তারিখে প্রদত্ত ঋণ হতে বেশি পরিমাণে উসুল করবে। শরিয়তের দৃষ্টিতে তা স্পষ্টতই সুদি কারবার। আল্লাহ তায়ালা সকলকে সুদ থেকে পানাহ দান করুন।

এ হলো ব্যাংকের মধ্যস্থতায় বৈদেশিক বাণিজ্যের সারকথা। তবে মৌলিকভাবে সব ব্যবসায়ী কার্যক্রম এই প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হওয়া আবশ্যক নয়। কেননা, ক্রেতা-বিক্রেতা একে অপরের উপর আস্থাশীল হলে ব্যাংকের মধ্যস্থতার প্রয়োজন নেই। চিঠি ও ফোনের মাধ্যমেও বেচাকেনা হতে পারে। পণ্য ও মূল্যের আদানপ্রদানও তারা তাদের সুবিধামতো করে নিতে পারেন।

তবে বৈদেশিক বাণিজ্যে কিছু ফিকহি বিষয় রয়েছে, যেগুলোর সমাধান ও ফিকহি বিশ্লেষণ জরুরি। নিম্নে সে বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে :

১. এই পদ্ধতিতে ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে বিক্রয়চুক্তি কখন সংঘটিত হবে তা

২. বিক্রীত পণ্যের নষ্ট হওয়া বা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি কখন বিক্রেতার দায় থেকে ক্রেতার দায়ে স্থানান্তরিত হবে?

৩. এলসির শরয়ী (تكييف) বিশ্লেষণ কী?

৪. এলসি ফির শরয়ী বিধান কী?

৫. মার্জিনে এলসি হলে গ্রাহকের পক্ষ থেকে প্রদেয় অর্থের শরয়ী অবস্থান কী?

৬. অ্যাডভাইজিং ব্যাংকের কার্যক্রমের শরয়ী বিশ্লেষণ (تكييف) কী?

৭. এলসির মাধ্যমে বেচাকেনা শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কি?

৮. বিল অব এক্সচেঞ্জের تظهير তথা মালিকানা হস্তান্তরের শরয়ী বিশ্লেষণ (تكييف) কী? এটা কি ঋণের বিক্রয়চুক্তি না حوالة চুক্তি?

৯. বিল অব এক্সচেঞ্জের সুদিপ্রক্রিয়া সংশোধনকল্পে শরিয়তসম্মত বিকল্প পদ্ধতি আছে কি?

উপরিউক্ত বিষয়গুলো সমসাময়িক বিজ্ঞ আলেমদের গভীর গবেষণা ও পর্যালোচনার বিষয়। আমরা এসকল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস পাব। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

বিক্রয়চুক্তি কখন সংঘটিত হবে?

প্রথম বিষয় হলো, বিক্রয়চুক্তি সংঘটিত হওয়ার সময় নির্ধারণ। তো কথা হলো, বেচাকেনা যদি ব্যাংকের মধ্যস্থতা ছাড়া হয় আর বিক্রীত পণ্য বিক্রেতার মালিকানায় এবং দখলে থাকে, তা হলে সাধারণ ইজাব (প্রস্তাব) কবুলের (গ্রহণ) মাধ্যমেই বিক্রয়চুক্তি পূর্ণতা লাভ করবে। এতে লিখিত-আকারে বিক্রয়চুক্তি সম্পাদন এবং আধুনিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন করার সকল বিধান প্রযোজ্য হবে।

পক্ষান্তরে যদি পণ্য বিক্রেতার মালিকানায় না থাকে কিংবা তার দখলে না থাকে, তা হলে ক্রেতা কর্তৃক পণ্যের আবেদন কেবল আবেদনই সাব্যস্ত হবে। কখনও তা ক্রয়ের অঙ্গীকার গণ্য হবে, কিন্তু তা ইজাব-প্রস্তাব সাব্যস্ত হবে না। এখন যদি বিক্রেতা তা সরবরাহ করতে সম্মত হয়, তা হলে এ সম্মতি ও তার পক্ষ থেকে ওয়াদা গণ্য হবে যে, সে পণ্যের মালিকানা-স্বত্ব লাভ করার

পর ক্রেতার নিকট তা বিক্রি করবে। অর্থাৎ উভয়পক্ষ থেকেই তা ওয়াদা বিবেচিত হবে এবং ওয়াদার সকল বিধান তাতে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। আর যদি লেনদেন ব্যাংকের মধ্যস্থতায় হয় অর্থাৎ এলসির মাধ্যমে হয়, তা হলে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার সময় অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন হবে। আমরা 'ওয়াদা' অধ্যায়ে আলোচনা করেছি, আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বিক্রির অঙ্গীকার (Agreement to sell) আর বিক্রয়চুক্তির (Sell) মাঝে পার্থক্য আছে। বিক্রয়ের অঙ্গীকার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, উভয়পক্ষ থেকে ভবিষ্যতের কোনো তারিখে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন করার ওয়াদা করা, অথবা কোনো শর্তসাপেক্ষে ক্রয়-বিক্রয় নিজেদের উপর আবশ্যক করে নেওয়া। এর দ্বারা পণ্যের মালিকানা ক্রেতার প্রতি স্থানান্তরিত হয় না। পক্ষান্তরে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হলে পণ্য ক্রেতার মালিকানায় চলে যায়। অবশ্য উভয় অবস্থার উপরই বিক্রয়চুক্তির Contract of sale পরিভাষা ব্যবহার হয়।

আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে, ওয়াদা একপক্ষ থেকে হোক কিংবা উভয় পক্ষ থেকে, তা আইনত (قضاءً) আবশ্যক হয় না। আর বিক্রয়চুক্তি সকল অবস্থায় আবশ্যক। কিন্তু 'ইজাব কবুল' অধ্যায়ে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, ওয়াদা যদিও মৌলিকভাবে আইনত (قضاءً) আবশ্যক নয়। কিন্তু বাস্তবিক ব্যবসায়ী প্রয়োজন দেখা দিলে উভয়পক্ষের উপরই কৃতওয়াদা আবশ্যক হতে পারে।

বলাবাহুল্য, বর্তমান ব্যবসাবাণিজ্যে এর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। বিশেষত আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্যে এবং বৃহদাকারের ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে। কেননা, এসব ক্ষেত্রে সাধারণত বিক্রেতার নিকট কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ পণ্য মজুদ থাকে না। বরং অধিকাংশ সময়ই ক্রেতার পক্ষ থেকে প্রস্তাব আসার পর বিক্রেতা তা প্রস্তুত বা সংগ্রহ ও সরবরাহ করে দেয়।

তো এসব অবস্থায় ক্রেতার পক্ষ থেকে ক্রয়প্রস্তাব আসার সাথে সাথে বিক্রয়-চুক্তি সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। কেননা পণ্য তখন বিক্রেতার মালিকানায় নেই আর দখলে থাকার তো প্রশ্নই আসে না। তা হলে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। অন্যদিকে বিক্রেতার এ নিশ্চয়তা চাই যে, সে কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ পণ্য প্রস্তুত বা সংগ্রহ ও সরবরাহ করলে ক্রেতা অবশ্যই তা নেবে। কেননা, সে তো ক্রেতার ওয়াদার উপর ভিত্তি করেই তা সংগ্রহ করেছে। যদি এক্ষেত্রে ক্রেতা কর্তৃক ওয়াদা আইনত আবশ্যক না হয়, তা হলে বিক্রেতা

স্পষ্টতই ক্ষতির সম্মুখীন হবে। কেননা, সে এত বিশাল পরিমাণ পণ্যের গ্রাহক সাধারণত খুঁজে পাবে না। বিশেষত পণ্য যদি ক্রেতার বিশেষ অভিরুচি অনুযায়ী তৈরি হয় আর বিক্রেতার দেশে এই পণ্যের চাহিদা না থাকে।

অনুরূপ ক্রেতারও এই নিশ্চয়তা চাই যে, বিক্রেতা যথাসময়ে কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ পণ্য তাকে সরবরাহ করবে। কেননা, সেও তো বিক্রেতার ওয়াদার উপর ভিত্তি করে অন্যকারও থেকে তা সংগ্রহের চেষ্টা করেনি। এখন যদি বিক্রেতা কৃতওয়াদা পূরণে অসম্মতি জানায় আর যথাসময়ে বিক্রয়চুক্তিতে আবদ্ধ না হয় তা হলে ক্রেতা ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

অবশ্য উভয়পক্ষ থেকে কৃতওয়াদা আইনত আবশ্যক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আরও বহুগুণে বেড়ে যায় যখন এই ক্রয়-বিক্রয়চুক্তি দু'দেশের মাঝে এলসিপ্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয়। কেননা এলসি উভয়পক্ষ থেকে আবশ্যক চুক্তির ভিত্তি ব্যতিরেকে সাধারণত খোলাই হয় না। অতএব, যদি কৃত-ওয়াদাচুক্তি আবশ্যক না হয় তা হলে আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্য সম্ভব হবে না। মোটকথা, এসব ক্ষেত্রে ওয়াদা আইনত আবশ্যক হওয়া উচিত।

উপর্যুক্ত আলোচনা দ্বারা একথাই প্রতীয়মান হয় যে, যদি পণ্য বিক্রেতার মালিকানা বা দখলে না থাকে আর চুক্তি 'এগ্রিমেন্ট টু সেলে'র ভিত্তিতে হয়, তা হলে বিক্রয়চুক্তি এই ওয়াদাপত্রে দস্তখতের দ্বারা সম্পন্ন হবে না। এসব ক্ষেত্রে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার দুটি পদ্ধতি হতে পারে।

১. পণ্যবিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত হওয়ার পর বিক্রেতা কোনো যোগাযোগমাধ্যম যথা : ফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল, টেলেক্স ইত্যাদির মাধ্যমে ক্রেতাকে অবহিত করবে এবং মৌখিকভাবে বা লিখিত আকারে ইজাব কবুলের মাধ্যমে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন করবে।

২. পণ্য অর্পণের মাধ্যমে تعاطی প্রক্রিয়ায় উভয়ের মাঝে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হবে। আমরা تعاطی অধ্যায়ে আলোচনা করেছি, বিক্রেতা কর্তৃক অর্পণ আর অপর পক্ষ হতে গ্রহণের দ্বারা বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হতে পারে। তো এলসিপ্রক্রিয়ায় বিক্রেতা কর্তৃক পণ্য শিপিং কোম্পানির নিকট হস্তান্তরের মাধ্যমে تعاطی সংঘটিত হবে আর এভাবে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হবে।

বিক্রীত পণ্যের ঝুঁকি

কখন বিক্রেতার দায় থেকে ক্রেতার দায়ে স্থানান্তরিত হবে?

দ্বিতীয় বিষয় হলো, কখন বিক্রীত পণ্যের রিস্ক-ঝুঁকি বিক্রেতা থেকে ক্রেতার দায়ে প্রবেশ করবে তা নির্ধারণ করা। আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্যে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী যদি ক্রেতা বা তার প্রতিনিধি পণ্য বুঝে নেওয়ার জন্য বিক্রেতার নিকট উপস্থিত থাকে, তা হলে ক্রেতা যখনই বিক্রেতা কর্তৃক পণ্যের উপর দখল লাভের অধিকার প্রাপ্ত হবে আর বিক্রেতা দখল লাভের সমস্ত প্রতিবন্ধক উঠিয়ে নেবে, তখনই পণ্যের ঝুঁকি ক্রেতার প্রতি স্থানান্তরিত হবে।

প্রচলিত এই রীতিটি ফিকহে হানাফীর সাথে মিলে যায়। কেননা, হানাফী মাযহাব-মতে বিক্রেতা কর্তৃক সমস্ত প্রতিবন্ধকতা উঠিয়ে নেওয়াকে অর্থাৎ সবধরনের প্রতিবন্ধকতাবিহীন পণ্য বুঝে নেওয়ার অধিকার যদি ক্রেতা লাভ করে, তা হলে তা শরয়ী কব্‌জ সাব্যস্ত হয়। এক্ষেত্রে হাতে হাতে কব্‌জ করা, মেপে নেওয়া, গোনে নেওয়া শর্ত নয়। যেমনটি 'কবজ'-দখল অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।[১৫]

---

১৫. **'দখল'-এর মূল কথা ও তার প্রকারভেদ**

কব্‌জ বা দখল লাভের মূলকথা হলো কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা ছাড়া পণ্যের ব্যবহার-ব্যয়ের ক্ষমতা অর্জন করা এবং সে পণ্যের ঝুঁকির দায় গ্রহণ করা; এই অবস্থায় যে, সে পণ্যের কোনো ক্ষতি হলে দখল লাভকারীর ক্ষতি সাব্যস্ত হবে। পণ্যের বিভিন্নতায় দখলের ধরনও বিভিন্ন হতে পারে। পণ্যের ধরন ও উরফ (প্রচলিত পদ্ধতি) অনুযায়ীই দখল সাব্যস্ত হবে। তবে উপর্যুক্ত মূলকথা অবশ্যই পাওয়া যেতে হবে। সাধারণত দুভাবে মালের উপর দখল লাভ করা যায়।

ক. কবযে হাকিকি বা প্রত্যক্ষ দখল।

খ. কবযে হুকমি বা পরোক্ষ দখল।

উদাহরণত প্রতিষ্ঠান নিজের কোনো কর্মকর্তা বা নিজ প্রতিনিধির মাধ্যমে মালের উপর সরাসরি দখল লাভ করলে তাকে 'কবজে হাকিকি' বলা হবে। আর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পণ্যের জাহাজিকরণ দলিল (Bill of Lading) গ্রহণের মাধ্যমে পরোক্ষ দখল অর্জিত হবে। গুদাম কর্তৃপক্ষের ইস্যুকৃত গুদামজাতকরণের সার্টিফিকেট পাওয়ার মাধ্যমেও পরোক্ষ দখল অর্জিত হবে।

মূলত বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতার অনুকূলে দখল হস্তান্তরের মাধ্যমে বস্তুগতভাবে পণ্য বুঝিয়ে দেওয়া হলে তাকে 'কবজে হাকিকি' বলে। পক্ষান্তরে ক্রেতা যাতে পণ্য ব্যবহার করতে পারে সেজন্য তা বিক্রেতার দখলমুক্ত-অধিকারমুক্ত, আলাদাকৃত ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে দেওয়া হলে—তা বাস্তবে স্থানান্তরিত করা না হলেও—যদি লিখিত বা

পক্ষান্তরে যদি ক্রেতা বা তার প্রতিনিধি বিক্রেতার শহরে উপস্থিত না থাকে তা হলে প্রচলিত ইন্টারন্যাশনাল আইন হলো, বিক্রেতা কর্তৃক যখন তা শিপিং কোম্পানির নিকট হস্তান্তর করা হবে তখন থেকে পণ্যের দায় ক্রেতার উপর বর্তাবে। এটি মাল বিক্রি আইন নং-২৩, ধারা ২-এর সারকথা। অর্থাৎ পণ্যের দখল বুঝে নেওয়ার ক্ষেত্রে শিপিং কোম্পানি ক্রেতার প্রতিনিধি গণ্য হবে। বহু মামলা-মোকদ্দমায় আদালত এই আইন অনুযায়ী ফায়সালা করেছে। যেমন :

> in view of ss 23 and 39, the goods are to be treated as delivered to the buyer and property and possession of the goods passes on to the buyer when the goods are handed over to the transporter.[১৬]

এখন প্রশ্ন হলো, প্রচলিত এ রীতি কি শরিয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য? উত্তর হলো, যদি ক্রেতা কোনো ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি নির্ধারণ করে দেয় আর বিক্রেতাকে সেই কোম্পানির মাধ্যমে ক্রেতার দেশে পণ্য প্রেরণের নির্দেশ দেয়, তা হলে ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি ক্রেতার প্রতিনিধি গণ্য হবে। অতএব ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির পণ্য বুঝে নেওয়াই ক্রেতার প্রতিনিধির পণ্য দখল বুঝে নেওয়া। আর শরিয়তের দৃষ্টিতে প্রতিনিধির দখল বুঝে নেওয়া গ্রহণযোগ্য। তাই এ সময় পণ্য ক্রেতার দায়ে প্রবেশ করবে এবং ঝুঁকি স্থানান্তরিত হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে যদি ক্রেতা কোনো ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি নির্ধারণ না করে, বরং বিক্রেতার উপর তা ছেড়ে দেয়, তারপর বিক্রেতা পণ্য পরিবহণের জন্য যেকোনো কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে তার নিকট পণ্য হস্তান্তর করে তা হলেও কি এটি ক্রেতার পক্ষ থেকে পণ্য বুঝে নেওয়া গণ্য হবে? আর এর কারণে কি দায় স্থানান্তরিত হয়ে যাবে?

মৌখিকভাবে এই অধিকার দেওয়া হয় যে, এখন থেকে তা ক্রেতার অধিকারভুক্ত হলো তার কথা অনুযায়ীই এখন তা স্থানান্তরিত ও ব্যবহৃত হবে, ক্রেতার ভোগ, বিক্রি বা দান করার পথে সকল প্রকার বাধা প্রত্যাহার করে নেওয়া হলো, তা হলে তা কবজে হুকমি সাব্যস্ত হবে।

উল্লেখ্য যে, বিক্রেতা কর্তৃক মালের দখল ক্রেতাকে বুঝিয়ে দেওয়ার বিষয়টি শরিয়তে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মালের ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার পর যদি তা ক্রেতার দখলে হস্তান্তর বা ক্রেতাকে বুঝিয়ে দেওয়ার পূর্বেই নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে এর দায়িত্ব বিক্রেতাকে বহন করতে হয়।

১৬. Pollock and mulla : On the sale of goods act, 1930, saction 23, P 203.

বাহ্যত মনে হয় এই অবস্থায় ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি বিক্রেতার প্রতিনিধি গণ্য হবে। কেননা, বিক্রেতাই তার সাথে ভাড়ার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। যেমনটি আমরা ভিপি-যোগে পণ্যপ্রেরণ শিরোনামে আলোচনা করেছি।

কিন্তু ক্রেতা যেহেতু বিক্রেতাকে ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি নির্ধারণের অধিকার দিয়েছে এবং এই ভিত্তিতেই সে তা নির্ধারণ করেছে, তা ছাড়া ব্যবসায়ী সমাজের প্রচলন অনুযায়ী বিক্রেতার দায়িত্ব তখনই শেষ হয়ে যায় যখন সে পণ্য ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির নিকট হস্তান্তর করে দেয়।

তো প্রচলিত এই রীতি বহাল থাকতে শরয়ী কোনো বাধা নেই। হানাফী ফকিহদের কারও কারও বক্তব্য দ্বারা এর বৈধতা স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয়। *ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়ায় তাতারখানিয়ার* উদ্ধৃতিতে উল্লেখ আছে,

> اذا قال المشترى للبائع: ابعث إلى ابنى، واستأجر البائع رجلا يحمله إلى ابنه، فهذا ليس بقبض، والأجر على البائع، إلا أن يقول: استأجر عليّ من يحمله، فقبض الأجير يكون قبض المشترى إن صدقه أنه استأجر ودفع إليه. وإن أنكر استئجاره والدفع إليه، فالقول قوله،

> যদি ক্রেতা-বিক্রেতাকে বলে, 'মাল আমার ছেলের নিকট পাঠিয়ে দাও', তখন বিক্রেতা ছেলের নিকট মাল পাঠাবার জন্য কোনো লোক ভাড়া করল, তা হলে এই লোকের মাল বুঝে নেওয়া কব্‌জ-দখল গণ্য হবে না। আর পারিশ্রমিক বিক্রেতা বহন করবে।

> তবে যদি ক্রেতা একথা বলে, 'আমার জন্য এমন কোনো লোক ভাড়া করো, যে আমার নিকট মাল পৌঁছে দেবে', তা হলে ভাড়া-করা লোকের মাল বুঝে নেওয়াই ক্রেতার কব্‌জ-দখল সাব্যস্ত হবে; যদি সে তাকে সত্যায়ন করে যে, সে ভাড়ার কথা বলেছে এবং পারিশ্রমিক অর্পণ করে দেয়। আর যদি ভাড়ার বিষয় এবং পারিশ্রমিকের বিষয় অস্বীকার করে, তা হলে তার কথাই গ্রহণ-যোগ্য হবে।[১৭]

উভয় মাসআলায় পার্থক্য হলো, প্রথম সুরতে ক্রেতা তার ছেলের নিকট মাল পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। মাল পৌঁছানোর জন্য কোনো লোক ভাড়া নেওয়ার

---

১৭. ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুল বুয়ু, চতুর্থ অধ্যায়, ৩/১৯।

নির্দেশ করেনি। তাই মাল পৌঁছানো বিক্রেতার দায়িত্ব ছিল। এখন বিক্রেতা যদি লোক ভাড়া নেয়, তা হলে নিজ দায়িত্বে ভাড়া নিয়েছে। এজন্য ওই লোকের কব্‌জ ক্রেতার কব্‌জ সাবস্ত হবে না।

আর দ্বিতীয় সুরতে ক্রেতা নির্দেশ করেছে তার খরচে লোক ভাড়া নেওয়ার জন্য। এ কারণে ভাড়া-করা লোক মালের দখল বুঝে নেওয়ার ক্ষেত্রে ক্রেতার প্রতিনিধি সাব্যস্ত হবে। সুতরাং তার দখল বুঝে নেওয়া যেন ক্রেতারই দখল বুঝে নেওয়া।

বলাবাহুল্য, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে শেষোক্ত সুরতই ঘটে থাকে। কেননা, ক্রেতাই বিক্রেতাকে এই নির্দেশ করে যে, মাল শিপিং কোম্পানির নিকট ডেলিভারি দেওয়া হোক। আর অধিকাংশ সময় পরিবহণের খরচ ক্রেতাই বহন করে। তবে কখনও উভয়ে এই মর্মে সম্মত হয় যে, পণ্যের পরিবহণ-খরচ বিক্রেতা বহন করবে। তখন বিক্রেতা পণ্যমূল্যের সমষ্টিতে তা যুক্ত করে দেয়। অতএব এ কারণে দখল বুঝে নেওয়ার বা দায় স্থানান্তরের বিধানে কোনো পরিবর্তন আসবে না।

মোটকথা, আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্যে প্রচলিত রীতিনীতি এক্ষেত্রে শরিয়তের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। তবে ডাকযোগে পাঠাবার ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতি সম্পূর্ণ বিপরীত। এক্ষেত্রে ডাক কর্তৃপক্ষ বিক্রেতার প্রতিনিধি সাব্যস্ত হয়। ফলে ক্রেতা বুঝে নেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মাল বিক্রেতার দায় ও ঝুঁকিতে থাকে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে শরিয়তের বিধানে পার্থক্য হয়ে যায়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যবোর্ড (International Chamber of Commerce) এ বিষয়ে বিস্তারিত নিয়মনীতি প্রণয়ন করেছে। প্রণীত এই নীতির নাম Inco terms; এতে রপ্তানি কার্যক্রমে বিভিন্ন খরচ কে বহন করবে এবং কখন মালের ঝুঁকি বিক্রেতা থেকে ক্রেতার দায়ে স্থানান্তরিত হবে এসব বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

তো আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রচলিত পরিভাষা অনুযায়ী ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে কৃতচুক্তিই নির্ধারণ করে দেবে, পরিবহণের খরচ কে বহন করবে? আর এই পরিভাষার আলোকেই আন্তর্জাতিক রীতি মালের দায় স্থানান্তরের সময়ও নির্ধারণ করে দেবে।

আমরা এখন সেসব পরিভাষা এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রচলিত রীতিনীতি সম্পর্কে আলোচনা করব, যেগুলোর আলোকে খরচ বহন এবং দায়

স্থানান্তরের বিষয়টি নির্ধারিত হয়। পাশাপাশি তৎসংশ্লিষ্ট শরয়ী বিধান আলোচনা করব।

EXW (Ex Works) এক্স ওয়ার্ক্স

এই পরিভাষা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিক্রেতা নিজ গৃহেই পণ্য বুঝিয়ে দেবে। এই দখল বুঝে নেওয়ার জন্য বিক্রেতা পণ্য থেকে সব প্রতিবন্ধকতা উঠিয়ে নেবে, যাতে করে ক্রেতা বাধাহীনভাবে তা হস্তগত করতে পারে। বাকি এটা তখনই সম্ভব যদি ক্রেতা বা তার প্রতিনিধি বিক্রেতার গৃহে উপস্থিত থাকে এবং সে মালের দখল বুঝে নেয়। এক্ষেত্রে বিক্রেতা কেবল পণ্য প্যাকেজিং খরচ বহন করবে। অন্যান্য ব্যয়—যেমন : বহন, স্থানান্তর, বিক্রেতার দেশ ও ক্রেতার দেশের শুল্ক ইত্যাদি সব ক্রেতার উপর বর্তাবে।

এক্স ওয়ার্ক্স পদ্ধতিতে যখনই ক্রেতার জন্য বিক্রেতা পণ্য থেকে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা উঠিয়ে নেবে তখনই বিক্রেতার দায়ের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

প্রচলিত এই রীতিটি ফিকহে হানাফীর সাথে শতভাগ মিলে যায়। কেননা, হানাফী মাযহাব-মতে বিক্রেতা কর্তৃক সমস্ত বাধা উঠিয়ে নেওয়া পণ্যের দখল বুঝে নেওয়া ও দায় স্থানান্তরের ক্ষেত্রে যথেষ্ট।

FCA (Free Carriar) ফ্রি ক্যারিয়ার

এই পরিভাষা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ক্রেতা কোনো স্থান বা কোনো কোম্পানি নির্ধারণ করে দেবে, বিক্রেতা যার নিকট পণ্য পৌঁছে দেবে। ওই স্থান পর্যন্ত পণ্য পৌঁছানোর যাবতীয় ব্যয় এবং মালের গুণগত মান যাচাইয়ের ব্যয় সম্পূর্ণরূপে বিক্রেতা বহন করবে। আর ওই স্থানে বা উক্ত ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির নিকট পৌঁছে দেওয়ার দ্বারা বিক্রেতার দায়ের পরিসমাপ্তি ঘটবে এবং এই স্থান থেকে ক্রেতা যাবতীয় ব্যয় বহন করবে।

এই মাসআলাটিও ফিকহে হানাফীর অনুকূলে। কেননা, ক্রেতাই স্থান বা ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি নির্ধারণ করে দিয়েছে। স্থান নির্ধারণের পাশাপাশি সে ওই ব্যক্তিও নির্ধারণ করে দেবে, যে ক্রেতার পক্ষ থেকে মাল হস্তগত করবে। এক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি ক্রেতার প্রতিনিধি গণ্য হবে। আর ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি নির্ধারণ করা হলে কোম্পানিই ক্রেতার প্রতিনিধি সাব্যস্ত হবে। বলাবাহুল্য, উভয় সুরতেই পণ্য দখল পূর্ণতা পাবে এবং দায় স্থানান্তরিত হবে।

FAS (Free alongside ship) ফ্রি অ্যালংসাইড শিপ

এই পরিভাষা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ক্রেতা সুনির্দিষ্ট জাহাজের কথা বলে দেবে, যা পণ্য বহন করবে। পাশাপাশি বন্দরও নির্ধারণ করে দেবে, যে বন্দরে পণ্য লোড করা হবে।

এ পদ্ধতিতে বিক্রেতা শিপিং কোম্পানির সাথে কোনো চুক্তি করে না। শিপিং কোম্পানির সাথে যাবতীয় চুক্তি ব্যয়-বহনসহ ক্রেতাই করবে। তবে মাল বন্দর পর্যন্ত পৌঁছানোর খরচ বিক্রেতাই বহন করবে। শিপ কর্তৃপক্ষের নিকট পণ্য পৌঁছানোর মাধ্যমে বিক্রেতার দায়ের পরিসমাপ্তি ঘটবে। পণ্য জাহাজি-করণের সময় যদি কোনো ক্ষতি হয়, তা হলে সে দায় বিক্রেতার উপর চাপানো যাবে না। তা ক্রেতার ক্ষতি বিবেচিত হবে।

বলাবাহুল্য, এই পদ্ধতিতে যেহেতু ক্রেতাই শিপ ও শিপিং কোম্পানি নির্ধারণ করে দিচ্ছে, তাই এই পদ্ধতির শরয়ী বিধানও পূর্বোক্ত পদ্ধতি থেকে ভিন্ন নয়। কেননা, এক্ষেত্রেও শিপিং কোম্পানি ক্রেতার প্রতিনিধি।

FOB (Free on Board) ফ্রি অন বোর্ড

এই পরিভাষা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এমন পদ্ধতি, যাতে পণ্য জাহাজিকরণও বিক্রেতার দায়িত্বে থাকে। অর্থাৎ পণ্য জাহাজিকরণের পূর্বে বিক্রেতা দায়মুক্ত হবে না। পণ্য জাহাজিকরণ হয়ে গেলে বিক্রেতা দায় মুক্ত হবে এবং পণ্য ক্রেতার দায়ে চলে যাবে।

এই পদ্ধতিতেও ক্রেতা শিপিং কোম্পানি নির্ধারণ করে দেয় এবং নিজ খরচেই কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। অবশ্য কোম্পানির সাথে ক্রেতার খরচে লেনদেন করার জন্য বিক্রেতাকেও সেই নির্দেশ করতে পারে। এ নির্দেশনা স্পষ্টও হতে পারে আবার এ ধরনের ব্যবসায় প্রচলিত রীতি অনুযায়ী উহ্যও হতে পারে। অনুরূপ উভয়ের মাঝে প্রচলিত পূর্বরীতি অনুযায়ীও হতে পারে। তবে বিক্রেতা সকল অবস্থায় মাল বন্দরে পৌঁছানো এবং তা জাহাজিকরণের দায়িত্ব সংরক্ষণ করবে। আর পণ্য বিক্রেতার দায় থেকে ক্রেতার দায়ে কেবল জাহাজিকরণের পরই প্রবেশ করবে। জাহাজিকরণের পর মালের ক্ষতি হলে সে দায় ক্রেতার উপর বর্তাবে।

বলাবাহুল্য, এই পদ্ধতিতেও শিপিং কোম্পানি ক্রেতার প্রতিনিধি সাব্যস্ত হবে। যদি ক্রেতাই শিপিং কোম্পানির সাথে চুক্তি করে তা হলে তো বিষয়টি স্পষ্ট।

আর যদি চুক্তি বিক্রেতা করে কিন্তু ক্রেতার নির্দেশক্রমে, তা হলে *ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াতে* উল্লেখিত বিষয়টি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ ক্রেতার নির্দেশক্রমে কেউ পণ্য বুঝে নিলে আর বিক্রেতা তার নিকট মাল হস্তান্তর করলে এর দ্বারা পণ্যের দখল ক্রেতা কর্তৃক বুঝে নেওয়া হয়েছে একথাই প্রমাণিত হবে।

CFR (Cost and Freight) কস্ট অ্যান্ড ফ্রেইট

CFR দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বিক্রেতাই নিজ খরচে শিপিং কোম্পানির সাথে পণ্য প্রেরণের চুক্তি করবে। অর্থাৎ ক্রেতা কর্তৃক নির্ধারিত বন্দরে মাল পৌছানোর দায়িত্ব বিক্রেতারই থাকবে। এবং পণ্য পরিবহণ-খরচও সে বহন করবে। তবে এই পদ্ধতিতেও পণ্য জাহাজিকরণের সাথে সাথে পণ্যের দায় প্রচলিত আন্তর্জাতিক রীতি অনুযায়ী ক্রেতার প্রতি স্থানান্তরিত হয়ে যাবে।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে, এই প্রক্রিয়ায় তো বিক্রেতা নিজ খরচে শিপিং কোম্পানির সাথে চুক্তি করেছে। ফলে শিপিং কোম্পানিকে বিক্রেতার প্রতিনিধি গণ্য হওয়া উচিত এবং শিপিং কোম্পানির পণ্য বুঝে নেওয়া ক্রেতার বুঝে নেওয়া সাব্যস্ত না হওয়া উচিত। কেননা, পণ্য এখনও বিক্রেতার প্রতিনিধির দখলে রয়ে গেছে।

কিন্তু যদি বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যে, ক্রেতা বিক্রয়চুক্তিতে এই পরিভাষা অর্থাৎ CFR (Cost and Freight) ব্যবহার করে বিক্রেতার হাতে এই দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে যে, সে তার ইচ্ছানুযায়ী শিপিং কোম্পানির সাথে চুক্তি করবে, যেন সে বলে দিলো,

ايما شركة تختارها للشحن فهى وكيلة لى فى قبض المبيع

যে কোম্পানিকেই তুমি মাল প্রেরণের জন্য পছন্দ করবে সেই পণ্যের দখল বুঝে নেওয়ার ক্ষেত্রে আমার প্রতিনিধি সাব্যস্ত হবে।

ফকিহগণ এধরনের প্রতিনিধি নিয়োগ বৈধ বলেছেন। যেমনটি *ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়ার* উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ক্রেতা-বিক্রেতাকে বলল,

استاجر على من يحمله، فقبض الاجير يكون قبض المشترى

> তুমি আমার জন্য কোনো লোক ভাড়া নাও, যে তা বহন করে পৌছে দেবে। তা হলে ভাড়াকৃত ব্যক্তির মাল বুঝে নেওয়াই ক্রেতার কব্‌জ-দখল গণ্য হবে।[১৮]

উল্লেখিত অবস্থায়ও ক্রেতা পণ্য বহনকারী ব্যক্তি নির্ধারণ করে দেয়নি। বরং তা বিক্রেতার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছে। অথচ তা সত্ত্বেও পণ্য বহনকারী ব্যক্তি দখল বুঝে নেওয়ার ক্ষেত্রে ক্রেতার প্রতিনিধি সাব্যস্ত হচ্ছে।

আর পণ্যের পরিবহণ-খরচ—যদিও তা বাহ্যত বিক্রেতা বহন করছে, কিন্তু বিক্রেতা সাধারণত তা পণ্যমূল্যের সাথে সংযোগ করে দেয়। অতএব শিপিং কোম্পানিকে ক্রেতার প্রতিনিধি সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে এর কোনো প্রভাব পরিলক্ষিত হবে না। তাই *ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া* থেকে উদ্ধৃত বিধানটি এখানে প্রয়োগ হবে। অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ায় পণ্য হস্তান্তর করার দ্বারাই বিধানগত দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রেতার কব্‌জ-দখল সাব্যস্ত হবে।

CPT (Crriage Paid to) ক্যারেজ পেইড টু

CPT পরিভাষাটি CFR-এর অনুরূপ। অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ায়ও পণ্য পরিবহণ-ব্যয় বিক্রেতা বহন করে থাকে এবং শিপিং কোম্পানির নিকট পণ্য হস্তান্তর দ্বারা দায় স্থানান্তরিত হয়।

তবে এই দুই পদ্ধতির মাঝে পার্থক্য হলো, যদি পণ্য পরিবহণ শিপের মাধ্যমে হয়, তা হলে CFR পরিভাষা ব্যবহার হবে। আর যদি তা ব্যাপক থাকে—যেকোনো মাধ্যম ব্যবহার করা যায়—যেমন : এয়ার কার্গো, স্থলকার্গো ইত্যাদি, তা হলে CPT পরিভাষা ব্যবহার হয়।

CPT-এর মধ্যে কখনও এমন হয় যে, একই পণ্যে পর্যায়ক্রমে একাধিক মাধ্যম ব্যবহার হয়। যেমন : মাল প্রথমে জাপান থেকে শিপ-যোগে সিংগাপুর পৌছল। এরপর সিংগাপুর থেকে ব্যাংকক। ব্যাংকক থেকে করাচি। এসব ক্ষেত্রে অবশ্য দায় স্থানান্তরের স্থান চুক্তিতে উল্লেখিত থাকে। আর যদি চুক্তিতে তা নির্ধারিত না থাকে তা হলে বিক্রেতার দায়িত্ব কেবল নিজ খরচে প্রথম বন্দরে পণ্য পৌছে দেওয়া। প্রথম বন্দরে পণ্য বুঝিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে।

---

১৮. ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, ৩/১৯; কিতাবুল বুয়ূ, চতুর্থ অধ্যায়।

CPT-এর শরয়ী বিধান CFR-এর অনুরূপ। অর্থাৎ কার্গো কোম্পানি ক্রেতার প্রতিনিধি সাব্যস্ত হবে।

CIF (Cost Insurance and Freight)
কস্ট ইনস্যুরেন্স অ্যান্ড ফ্রেইট

CIF-এর পরিভাষা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বিক্রেতা পণ্যের পরিবহণখরচ বহনের পাশাপাশি পথের ঝুঁকির মোকাবেলায় যে পণ্যবীমা করা হয় তার ব্যয়ভারও বহন করবে। এই পদ্ধতিতেও আন্তর্জাতিক ব্যবসারীতি অনুযায়ী পণ্য জাহাজিকরণের সাথে সাথে বিক্রেতা দায়মুক্ত হয়ে যাবে। পণ্য ক্রেতার দখলে প্রবেশ করবে। শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে দুইটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য।

এক

এই পদ্ধতিতে কোনো সুনির্দিষ্ট বন্দরে মাল পৌছানো বিক্রেতার জন্য আবশ্যক নয়। তবে যদি চুক্তিপত্রে তা স্পষ্টত নির্ধারণ করে দেয়, তা হলে ভিন্ন কথা। যেমনটি Inco terms-এ উল্লেখ হয়েছে। এজন্যই ক্রেতার জন্য উচিত হলো তা বিক্রয়চুক্তিতেই নির্ধারণ করে দেওয়া। কেননা কোনো অনির্ধারিত বন্দরে পৌছে দেওয়ার দ্বারা ঝুঁকি স্থানান্তর বা বিক্রেতার দায়মুক্ত হয়ে যাওয়ার বিষয়টি সন্দেহযুক্ত থেকে যায়।

দুই

পথের ঝুঁকির মোকাবেলায় বিক্রীত দ্রব্যের বীমা সাধারণত প্রচলিত ধারার শরিয়তনিষিদ্ধ বীমাপদ্ধতিতেই হয়ে থাকে। এতে শরিয়তনিষিদ্ধ 'গারার'-এর উপস্থিতি রয়েছে। সমসাময়িক প্রায় সকল আলেম ও ফিকহি সেমিনারের সিদ্ধান্ত হলো, এই বীমাচুক্তি নাজায়েয ও শরিয়তনিষিদ্ধ। কোনো মুসলিমের জন্য এমন চুক্তিতে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ নেই।

سوكرة সাওকারা ও জলজবীমা

আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী রহ. এর যুগে 'সাওকারা' নামে একধরনের জলজবীমার প্রচলন ছিল। তিনি তার ধরন ও বিধান উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

جرت العادة ان التجار إذا استأجروا مركبا من حربيٍّ يدفعون له أجرته، ويدفعون أيضا مالا معلوما لرجل حربي مقيم في بلاده،

يسمى ذلك المال "سوكرة"، على أنه مهما هلك من المال الذى فى المركب بحرق، أوغرق، أو نهب، أو غيره، فذلك الرجل ضامن له بمقابلة ما يأخذه منهم. وله وكيل عنهم مستأمن فى دارنا، يقيم فى بلاد السواحل الإسلامية بإذن السلطان، يقبض من التجار مال السوكرة، وإذا هلك من مالهم فى البحر شيئ، يؤدى ذلك المستأمن للتجار بدله تماما. والذى يظهر لى أنه لا يحل للتجار أخذ بدل الهالك من ماله.

আমাদের দেশে এই প্রচলন আছে যে, ব্যবসায়ীগণ যখন কোনো হারবি কাফের (বিধর্মী রাষ্ট্রে অবস্থানরত কাফের) থেকে কোনো বাহন ভাড়া নেয়, তখন ভাড়া প্রদান করার পাশাপাশি নিজ দেশে অবস্থানরত ওই হারবি কাফেরকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিয়ে থাকে, যে অর্থকে সওকারা বলা হয়।

এ সাওকারা প্রদানের কারণে যদি বাহনের ওই সম্পদ নষ্ট হয়ে যায়, পুড়ে যাওয়ার কারণে, অথবা ডুবে যাওয়া কিংবা ছিনতাই বা অন্য-কোনো কারণে তা খোয়া যায়, তা হলে ওই হারবি ব্যক্তি এর জামিন হবে। কেননা, সে জামানতের মোকাবেলায় অর্থ গ্রহণ করেছে।

আমাদের ইসলামী রাষ্ট্রে ওই হারবি ব্যক্তির প্রতিনিধি থাকবে। রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতিক্রমে সে উপকূলীয় এলাকায় অবস্থান করবে এবং ব্যবসায়ীদের থেকে সাওকারা অর্থ গ্রহণ করবে।

আর যদি ব্যবসায়ীদের কোনো সম্পদ সাগরে বিনষ্ট হয়ে যায় তা হলে আমাদের দেশে অবস্থানরত ওই প্রতিনিধি ব্যবসায়ীদের পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করবে। (আল্লামা শামী বলেন,) আমার নিকট স্পষ্ট যে, ব্যবসায়ীর জন্য এভাবে তার নষ্ট হওয়া বা খোয়া যাওয়া মালের ক্ষতিপূরণ নেওয়া নাজায়েয।

এরপর তিনি অবৈধতা প্রমাণে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। সর্বশেষে তিনি বলেছেন,

نعم! قد يكون للتجار شريك حربي في بلاد الحرب، فيعقد شريكه هذا العقد مع صاحب السوكرة في بلادهم، ويأخذ منه بدل الهالك، ويرسله إلى التاجر. فالظاهر أن هذا يحل للتاجر أخذه، لأن العقد الفاسد جرى بين حربيين في بلاد الحرب، وقد وصل إليه مالهم برضاهم، فلامانع من أخذه.

তবে হ্যাঁ, কোনো মুসলিমব্যবসায়ীর যদি কাফের রাষ্ট্রে অবস্থানরত কোনো কাফের পার্টনার থাকে, আর ওই পার্টনার তার দেশের কোনো সাওকারাওয়ালার সাথে এই চুক্তি করে আর নষ্ট হলে তার ক্ষতিপূরণ নিয়ে মুসলিমব্যবসায়ীর নিকট পাঠিয়ে দেয়, তা হলে এই অর্থ গ্রহণ করা উক্ত ব্যবসায়ীর জন্য হালাল হবে। কেননা, এক্ষেত্রে ফাসেদ চুক্তি কাফের রাষ্ট্রে অবস্থানরত দুই কাফেরের মাঝে সংঘটিত হয়েছে। আর মুসলিমব্যবসায়ীর নিকট তাদের অর্থ তাদের সন্তুষ্টচিত্তেই পৌঁছেছে। বিধায় তা গ্রহণ করতে কোনো সমস্যা নেই।[১৯]

সারকথা, যদি এ ধরনের চুক্তি বিধর্মীরাষ্ট্রে অবস্থানরত দুই বিধর্মীর মাঝে সংঘটিত হয় আর ইসলামীরাষ্ট্রে অবস্থানরত কোনো মুসলিমসদস্যের নিকট বীমা দাবি পৌঁছে, তা হলে মুসলিমের জন্য তা গ্রহণ করা বৈধ।

আল্লামা শামী রহ. অবশ্য এই মাসআলার পরে একথাও লিখেছেন যে, 'যদি কোনো মুসলিমব্যবসায়ী কাফেররাষ্ট্রে গিয়ে কোনো কাফেরের সাথে এ ধরনের চুক্তি করে আর মুসলিমরাষ্ট্রে অবস্থানরত কোনো কাফের, যে তার প্রতিনিধি, তার থেকে বীমা দাবি উসুল করে, আদালতের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া, তা হলে মুসলিমব্যবসায়ীর জন্য তা গ্রহণ করা বৈধ।

কিন্তু আল্লামা শামী রহ. এর এই ফতোয়ার ভিত্তি হলো, কাফেররাষ্ট্রে অবস্থানরত কাফের থেকে তার সন্তুষ্টচিত্তে যেকোনো মাল গ্রহণ করা বৈধ, হোক তা শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো ফাসেদ চুক্তির মাধ্যমে।

---

১৯. রদ্দুল মুহতার, ১২/৬৪৩; কিতাবুল জিহাদ, 'কাফের ব্যক্তিকে আমান দেওয়া প্রসঙ্গ'।

এ ব্যাপারে আমরা 'সরফ' অধ্যায়ের শেষে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমরা উল্লেখ করেছি, জুমহূর আলেমের অভিমত হলো, বিধর্মীরাষ্ট্রেও সুদি লেনদেন হারাম। এটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য অভিমত। এই মতের আলোকে মুতাআখ্খিরীন হানাফী ফকিহগণ ফতোয়া দিয়ে থাকেন।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা একথাই প্রমাণিত হলো যে, কোনো মুসলমানের জন্য এরূপ বীমা চুক্তি করার সুযোগ নেই। নিজেও করতে পারবে না, বিক্রেতাকেও এরূপ নির্দেশ দিতে পারবে না।

যদি আমরা মেনে নিই যে, বিক্রেতা বিধর্মীরাষ্ট্রে অবস্থানরত বিধর্মী আর সে-ই মূলত নিজ খরচে বীমাচুক্তি করছে কিন্তু কথা হলো, যদি বিক্রয়চুক্তিতে একথার উল্লেখ থাকে যে, CIF পদ্ধতিতে পণ্য প্রেরণ করতে হবে, তা হলে ক্রেতার পক্ষ থেকে তা নির্দেশ বিবেচিত হবে যে, বিক্রেতা যেন পণ্য প্রেরণের পূর্বে বীমাচুক্তি করে নেয়। আর মুসলিমক্রেতার জন্য বিক্রেতাকে এ ধরনের নির্দেশ দেওয়া জায়েয নেই।

অবশ্য বর্তমানে তাকাফুল নামে বীমার বিকল্পের কথা বলা হচ্ছে এবং বিভিন্ন ইসলামী রাষ্ট্রে সেই আলোকে কাজও হচ্ছে। সমসায়িক বহু আলেম এবং বিভিন্ন শরিয়াহবোর্ড তা অনুমোদনও করেছে। 'ইসলামী ফেকাহ একাডেমি জেদ্দা' রিয়াদে অনুষ্ঠিত বিশতম কনফারেন্সের সিদ্ধান্তাবলিতে এর বৈধতার ফতোয়া দিয়েছে। এখানে অবশ্য বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। তবে মোদ্দাকথা হলো, যদি বীমার শরিয়তসম্মত বিকল্প পাওয়া যায় তা হলে এর থেকে উপকৃত হতে সমস্যা নেই।

ক্রেতার নিকট পণ্য প্রেরণের ক্ষেত্রে উল্লেখিত পরিভাষা ছাড়াও কিছু পরিভাষা ব্যবহার হয়। তবে প্রায়গুলোই ব্যয়বহন ও ঝুঁকি স্থানান্তরের ক্ষেত্রে উল্লেখিত সাত পরিভাষার প্রতি আবর্তিত হয়।

এক দেশ থেকে পণ্য ক্রয় করে সেই দেশ থেকেই সরাসরি অন্যদেশে পাঠিয়ে দেওয়া

কবজ বা দখল লাভ হওয়া এবং দায় স্থানান্তরের উপর ভিত্তি করেই এ বিষয়ের ফায়সালা করা হবে যে, ক্রেতা কখন এই পণ্য তৃতীয় ব্যক্তির নিকট বিক্রি করতে পারবে। যখনই পণ্য ক্রেতার দায়ে প্রবেশ করবে এবং ক্রেতার দখল সাব্যস্ত হবে, তখন এই পণ্য অন্যত্র বিক্রি করতে পারবে।

উদাহরণত কোনো পাকিস্তানি ব্যবসায়ী সউদিআরবের কোনো কোম্পানি থেকে মালের অর্ডার পেল। এখন এই পাকিস্তানি ব্যবসায়ী এই মাল জাপান থেকে আমদানি করে সউদিআরবে রপ্তানি করবে। তো ব্যবসায়ী চায় মাল জাপান থেকেই সরাসরি সউদিআরবে পাঠিয়ে দিতে। কেননা, প্রথমে জাপান থেকে পাকিস্তান এনে এরপর সউদিআরবে পাঠানোর মাঝে অনর্থক বিষয়টি দীর্ঘ করা এবং পরিবহণ খরচ বৃদ্ধি করা বৈ কিছু নয়। এখন প্রশ্ন হলো, সরাসরি এভাবে পাঠিয়ে দেওয়া জায়েয হবে কি?

এব্যাপারে অধমের অভিমত হলো, আমরা যদি উল্লেখিত আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনে নিই, রপ্তানিকারক শিপিং কোম্পানিকে পণ্য হস্তান্তর করার সাথে সাথে পণ্যের দায় ক্রেতার প্রতি স্থানান্তরিত হয়ে যায় এবং পণ্য বুঝে নেওয়ার ক্ষেত্রে শিপিং কোম্পানি ক্রেতার প্রতিনিধি গণ্য হয়, তা হলে শিপিং কোম্পানির নিকট পণ্য হস্তান্তরের পর পাকিস্তানি ব্যবসায়ী এই মাল সউদিব্যবসায়ীর নিকট বিক্রি করতে পারবে। কেননা, এই বিক্রি দখল লাভ ও দায় স্থানান্তরের পর হচ্ছে। ফলে ربح ما لم يضمن 'ঝুঁকি গ্রহণের পূর্বে লাভ'-এ আপত্তি উত্থাপিত হবে না।

তবে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, এই মাল সউদি-ব্যবসায়ীর হাতে পৌঁছা পর্যন্ত পাকিস্তানি ব্যবসায়ীর কবজ-দখলেই থাকবে। সউদি-ব্যবসায়ী বা তার কোনো প্রতিনিধি এই মাল হস্তগত করার পূর্বপর্যন্ত এর দায় সউদি-ব্যবসায়ীর প্রতি স্থানান্তরিত হবে না। বিধায় সউদি ব্যবসায়ী তা হস্তগত করার পূর্বে অন্যত্র বিক্রি করতে পারবে না। অন্যথায় দখল লাভের পূর্বে বিক্রি করার কঠিন আপত্তি আসবে, যা চুক্তিকে আবশ্যকভাবে ফাসেদ করে দেবে।

পক্ষান্তরে যদি চুক্তিতে এরূপ উল্লেখ থাকে যে, জাপানি ব্যবসায়ীকর্তৃক শিপিং কোম্পানিকে মাল হস্তান্তরের সাথে সাথে তা সউদি ব্যবসায়ীর দায়ে প্রবেশ করবে, তা হলে তা নাজায়েয হবে। কেননা, এই প্রক্রিয়ার কোনো ক্ষেত্রেই মাল পাকিস্তানি ব্যবসায়ীর দায়ে স্থানান্তরিত হয়নি। অতএব পাকিস্তানি ব্যবসায়ী তা অন্যত্র বিক্রি করতে পারবে না। অন্যথায় দখল লাভের পূর্বে বিক্রি করা এবং ঝুঁকি গ্রহণের পূর্বে বিক্রি করার মতো কঠিন আপত্তিগুলো দেখা দেবে।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল, বর্তমানে যে মাল পথিমধ্যে থাকা অবস্থায় একই পণ্যের উপর পর্যায়ক্রমে অনেকগুলো বিক্রি হতে থাকে, তা

শরিয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নাজায়েয। এর দ্বারা পুঁজিবাজারে প্রচলিত মুদারাবা চুক্তিগুলোর দ্বার (Speculative transactions) বন্ধ হতে পারে। তা ছাড়া এর দ্বারা পুঁজি বাজারে প্রচলিত অন্যান্য বহু ত্রুটি-বিচ্যুতির সমাধান হতে পারে। আল্লাহ তায়ালা অধিক অবগত।

ব্যাংক-এলসির শরয়ী বিশ্লেষণ

এলসির মাধ্যমে বেচাকেনা করা হলে এলসির (تكييف) শরয়ী বিশ্লেষণ জানা প্রয়োজন। ব্যাংক এলসি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে নিম্নোক্ত কাজগুলো করে থাকে।

১. এলসি ইস্যু করা। গ্রাহকপ্রদত্ত শর্তগুলো যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা। শর্ত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেসব শর্ত, যর উপর এলসিমূল্য পরিশোধ নির্ভরশীল। সাধারণত এসব শর্ত ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে যায়।

২. বিক্রেতার নিকট অথবা তার ব্যাংকের নিকট এলসি প্রেরণ করা।

৩. বিক্রেতার পক্ষ থেকে প্রেরিত ডকুমেন্ট গ্রহণ করা। এগুলোর মাঝে বিএল বিল (মেমো) বীমা ডকুমেন্ট (যদি এলসিশর্তে তা থাকে)।

৪. ডকুমেন্টগুলো যাচাই-বাছাই করা। তা শর্ত অনুযায়ী এবং এলসিতে বর্ণিত গুণাবলির অনুকূলে কি না তা দেখা।

৫. ডকুমেন্টে এলসির সাথে কোনো বৈপরীত্ব থাকলে তা ক্রেতাকে জানিয়ে দেওয়া এবং শর্তানুযায়ী না হওয়া সত্ত্বেও সে ডকুমেন্ট গ্রহণ করবে কি না তা জিজ্ঞাসা করা। যদিও এটা তার জন্য আবশ্যক নয়। এলসি ইস্যুকারী ব্যাংকের এই অধিকার থাকবে যে, সে বৈপরীত্বের কথা ক্রেতাকেও জানাতে পারে আবার ক্রেতাকে না জানিয়ে ডকুমেন্ট ফেরতও পাঠাতে পারে। তবে প্রচলিত রীতি হলো, যদি সামান্য পার্থক্য হয় তা হলে ব্যাংক ক্রেতার সাথে আলোচনা করে আর বড়োধরনের পার্থক্য হলে সরাসরি সে নিজেই তা ক্যানসেল করে দেয়।

৬. যদি ক্রেতাকে এলসি শর্তানুযায়ী না হওয়ার বিষয়টি জানানো হয় আর ক্রেতা তা এ কারণে গ্রহণ না করে, তা হলে ব্যাংক তা বিক্রেতাকে বা বিক্রেতার ব্যাংকে জানিয়ে দেবে যে, ডকুমেন্ট এলসিতে উল্লেখিত শর্ত ও গুণাবলি অনুযায়ী নয়। এবং সাথে সাথে বৈপরীত্বের বিষয়গুলো চিহ্নিত করে দেবে। তা ছাড়া ব্যাংকের জন্য আবশ্যক হলো বিক্রেতার পক্ষ

থেকে জবাবপ্রাপ্তি কিংবা ক্রেতাকর্তৃক তা গ্রহণের পূর্বপর্যন্ত ডকুমেন্টগুলো সংরক্ষণ করা। তবে ব্যাংকের এই অধিকারও থাকবে যে, সে ডকুমেন্ট বিক্রেতার নিকট ফেরত পাঠাবে। এবং এলসিমূল্য পাঠানোর বিষয়টি ক্যানসেল করে দেবে।

৭. এলসিতে উল্লেখিত শর্ত এবং বিবরণ অনুযায়ী বিক্রেতার নিকট এলসি-মূল্য পাঠানো।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এলসি ইস্যুকারী ব্যাংকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো বিক্রেতাকে মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করা। বিক্রেতা পণ্য প্রেরণ করে ডকুমেন্ট পাঠাবে। আর ব্যাংক তাকে মূল্য পরিশোধ করে দেবে।

তাই এলসি ইস্যু করা মানে, মূল্য পরিশোধকল্পে 'কাফালা চুক্তি'[২০] করা। অবশ্য তা সাধারণ কাফালাচুক্তি থেকে কিছুটা ব্যতিক্রম। কেননা, সাধারণ কাফালাচুক্তি আবশ্যক পাওনার উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে। যেমন : কাফিল বলল, 'আমি অমুকের উপর আবশ্যক হওয়া ঋণের জামিন হলাম'। তা ছাড়া কাফিল সাধারণত জামিন হয় তখন, যখন ঋণী ব্যক্তি ঋণ আদায়ে ব্যর্থ হয় অথবা গড়িমসি করে। কিন্তু ব্যাংক হতে এলসিকার্যক্রম একটি স্বতন্ত্র নিশ্চয়তাপ্রদান। এখানে এলসিতে উল্লেখিত শর্তাবলির অনুকূলে ডকুমেন্টগুলো উপস্থাপিত হলেই ব্যাংক এলসিমূল্য পরিশোধ করতে বাধ্য থাকে।

---

২০. الكفالة। কাফালা

কাফালা শরিয়তের একটি পরিভাষা। এর অর্থ দায় গ্রহণ বা যামিন হওয়া। এজন্য একে জামানতও বলা হয়। মূলত কাফালার শাব্দিক অর্থ সংযুক্তকরণ। যেহেতু কাফালায় দায়গ্রস্ত ব্যক্তির দায়ের সাথে দায় গ্রহণকারী ব্যক্তির দায়কে সংযুক্ত করা হয়, তাই একে 'কাফালা' বলে। যে ব্যক্তি দায় গ্রহণ করেছে তাকে كفيل 'কাফিল' এবং যার পক্ষ হয়ে দায় গ্রহণ করা হয়েছে, অর্থাৎ মূল দায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে مكفول عنه 'মাকফুল আনহু' বলে। আর যার জন্য দায় গ্রহণ করা হয়েছে তাকে مكفول له 'মাকফুল লাহু' বলে এবং যে বস্তুর দায় গ্রহণ করা হয়েছে তাকে مكفول به 'মাকফুল বিহী' বলে।

উদাহরণত যায়েদ বকরের নিকট এক লক্ষ টাকা পাবে। এজন্য যায়েদ 'কাফিল' চেয়েছে। এখন খালেদ এই দায় গ্রহণে সম্মত হয়েছে। এক্ষেত্রে খালেদ দায় গ্রহণকারী 'কাফিল', মূল দায়গ্রস্ত বকর 'মাকফুল আন্হু' আর যায়েদ 'মাকফুল লাহু' এবং এক লক্ষ টাকা 'মাকফুল বিহী'। —অনুবাদক।

এক্ষেত্রে ক্রেতার ভিন্ন কোনো দাবি, যেমন : তার মাঝে এবং ওই বিক্রেতার মাঝে সংঘটিত কোনো কারণে মূল্য পরিশোধ আবশ্যক নয়- গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং এক্ষেত্রেও ব্যাংক মূল্য পরিশোধে বাধ্য থাকবে। তবে এই ভিন্নতার কারণে কাফালাচুক্তি প্রভাবিত হবে না।

'কাফালাচুক্তি স্বতন্ত্র' একথার উদ্দেশ্য

মূলত বিক্রয়চুক্তি থেকে কাফালাচুক্তি স্বতন্ত্র এই কথার উদ্দেশ্য হলো, ব্যাংক ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে গৃহীত শর্তাবলি ও বিক্রয়চুক্তির আনুষঙ্গিক কোনো ঝামেলায় জড়াতে চায় না। এলসি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বিক্রেতাকে নিশ্চয়তা প্রদান করে তাকে চিন্তামুক্ত করা যে, সে অবশ্যই মূল্য পেয়ে যাবে। আর ক্রেতা এই নিশ্চয়তা লাভ করে যে, নির্ভরযোগ্য ডকুমেন্টপ্রাপ্তির পূর্বে মূল্য পরিশোধ করা হবে না।

আসলে বিক্রয়চুক্তি থেকে কাফালাচুক্তিটি স্বতন্ত্র- এটি একটি কাগুজে বিষয়। অন্যথায় বিক্রেতার কোনো ক্ষেত্রেই এই সুযোগ নেই যে, সে দুইবার মূল্য দাবি করবে। একবার এলসির কারণে ব্যাংকের নিকট, আরেকবার বিক্রয়চুক্তির কারণে ক্রেতার নিকট। কেননা, বিক্রয়চুক্তি যদি এলসিপ্রক্রিয়ায় হয়ে থাকে তা হলে একথা স্পষ্ট যে, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে যে, মূল্য কেবল এলসি ইস্যুকারী ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হবে, অন্যকোনো পন্থায় নয়। তাই কাফালার মৌলিক সব বৈশিষ্ট এখানে বিদ্যমান।

তবে একথা স্বীকৃত যে, এলসিচুক্তিতে কাফালা ছাড়া অন্যান্য সেবাপ্রদানের বিষয়টিও বিদ্যমান থাকে। যেমন :

এলসিপত্র প্রস্তুতকরণ, এলসিতে গ্রাহকের কাঙ্ক্ষিত শর্তাবলির বিবরণ পেশ করা, বেনিফিশিয়ারি কিংবা ব্যাংকের নিকট এলসিপ্রেরণ, অ্যাডভাইজিং ব্যাংক البنك المراسل এর সাথে ডকুমেন্ট আদানপ্রদান, শিপিংডকুমেন্ট সংগ্রহকরণ, এলসিতে বর্ণিত শর্তাবলি ও বিবরণের সাথে ডকুমেন্ট মিলিয়ে দেখা, ডকুমেন্ট হস্তগত হওয়ার বিষয়টি এলসিগ্রাহককে অবহিতকরণ, গ্রাহকের পক্ষ থেকে তা হস্তগত করার অনুমতিগ্রহণ, বিক্রেতা বা তার ব্যাংকের নিকট পণ্যমূল্য প্রেরণ, ডকুমেন্ট কাঙ্ক্ষিত শর্তাবলি ও বর্ণনার সাথে না মিললে তা বিক্রেতা বা বিক্রেতার ব্যাংককে জানিয়ে দেওয়া, ক্রেতা-বিক্রেতার পক্ষ থেকে দিকনির্দেশনা আসা পর্যন্ত ডকুমেন্ট সংরক্ষণ করা ইত্যাদি।

যেহেতু এলসিতে 'কাফালা, ওকালা' এবং আরও কিছু সেবাপ্রদানের বিষয় যুক্ত রয়েছে তাই আমরা প্রত্যেকটি বিষয় স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করব, যাতে করে এলসিগ্রাহক থেকে ব্যাংককর্তৃক যে ফি উসুল করা হয় তার বাস্তব অবস্থা জানা যায়।

তবে একথা সত্য যে, এলসিতে মূল বিষয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নিশ্চয়তাপ্রদান তথা কাফালা। এজন্য সর্বপ্রথম আমরা এ নিশ্চয়তাপ্রদানের ফি সম্পর্কে আলোচনা করব।

উল্লেখ্য যে, কখনও কখনও এলসি ছাড়াও গ্যারান্টিপত্র ইস্যু করা হয়ে থাকে।

গ্যারান্টিপত্রের ফিয়ের বিধান

জামানত বা কাফালার কারণে কোনো প্রকার ফি গ্রহণ করা জয়েয নেই। এটা ফিক্‌হে ইসলামীর স্বীকৃত বিষয়। কেননা, 'কাফালা' ঋণের মতো সেবাচুক্তি। এটি বিনিময়চুক্তি নয়। ইমাম ইবনুল মুনযির রহ. এই বিষয়ে উম্মাহর ঐকমত্য উল্লেখ করেছেন। তিনি তার 'কিতাবুল ইশরাফে' বলেছেন,

> أجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم أن الحمالة (وهى الكفالة) بجعل يأخذه الحميل (اى الكفيل) لا تحل ولا تجوز
>
> অনুসরণীয় সকল আলেম এবিষয়ে একমত যে, বিনিময়যুক্ত কাফালাতে যে-বিনিময় কাফালাদাতা গ্রহণ করে থাকে তা জায়েয নেই, বরং তা হারাম।

তারপর তিনি বলেন,

> واختلفوا فى ثبوت الضمان على هذا الشرط، فكان الثورىّ يقول: إذا قال الرجل للرجل: أكفل عنى ولك ألف درهم، فإنّ الكفالة جائزة، وترد إليه الألف درهم.... وقال أحمد فى مسئلة الكفالة: ما أرى هذا يأخذ شيئا بحق. وقال إسحق: ماأعطاه من شيئ فهو حسن.
>
> এ বিনিময়ের শর্ত করা হলে সেই জামানতচুক্তি সহীহ হবে কি না এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। সুফিয়ান সাওরী রহ. বলেন, যদি এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে বলে, 'তুমি আমার পক্ষে কাফিল হও। তোমাকে এক হাজার দিরহাম দেবো' তা হলে কাফালাচুক্তি সহীহ

হবে। তবে এক হাজার দিরহাম তাকে ফেরত দেওয়া হবে। ...
কাফালা বিষয়ে ইমাম আহমাদ বলেন, 'আমার মতে কাফিল বৈধপন্থায় কোনো জিনিস নিতে পারবে না'। তবে ইমাম ইসহাক বলেন, (বিনিময়ের শর্ত ছাড়া) যদি কিছু দেয় তা হলে তা উত্তম।[২১]

ইসহাক ইবনে রাহুয়া রহ. থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, সে ব্যাপারে এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, যদি বিনিময়ের শর্তহীন কাফালাচুক্তি হয় আর স্বেচ্ছায় কাফিলকে কিছু দেওয়া হয় তা হলে তা জয়েয আছে। যদিও তাঁর বক্তব্যটি বিনিময়ের শর্তযুক্ত কাফেলার সাথেই উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা শুরুতে বলা হয়েছে,

اذا قال الرجل للرجل "اكفل عنى ولك الف درهم"

যখন এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে বলল, তুমি আমার পক্ষে কাফিল হও, তোমাকে এক হাজার দিরহাম দেওয়া হবে।

আর এই বর্ণনাটি ইমাম কাওসাজ মারওয়াজী রহ. (মৃত্যু ২৫১ হিজরি) এর আলোচনায় বেশি স্পষ্ট। তিনি লেখেন,

قال سفيان: إذا قال رجل لرجل: أكفل عنى ولك ألف درهم، الكفالة جائزة، ويرد عليه ألف درهم. قال أحمد: ما أرى هذا يأخذ شيئا بحق. قال إسحق: ماأعطاه من شيئ فهو حسن.

সুফিয়ান সাওরী রহ. বলেন, যদি এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে বলে, তুমি আমার পক্ষে কাফিল হও তোমাকে এক হাজার দিরহাম দেওয়া হবে, তা হলে কাফালা সহীহ হবে। তবে এক হাজার দিরহাম ফেরত দিতে হবে। ইমাম আহমাদ রহ. বলেন, আমার মতে কাফিলের জন্য কোনো জিনিস গ্রহণ করা বৈধ হবে না। ইমাম ইসহাক বলেন, যদি কোনো জিনিস দেওয়া হয় তা হলে তা উত্তম বিবেচিত হবে।[২২]

---

২১. আল ইশরাফ আলা মাযাহিবি আহলিল ইলম : ১: ১২০।
২২. مسائل الامام احمد واسحاق بن راهوية : ٦ : ٣٠٠٥ – فقرة: ٢٢٩٩ ، عمادة البحث العلمى الجامعة الاسلامية المدينة المنورة

কিন্তু ইমাম ইসহাক রহ. এর এই অর্থের সম্ভাবনাময় এই ইবারত ইজমার মোকাবেলায় টেকে না। তা ছাড়া অনেক ফকিহ এই নিষেধাজ্ঞার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, তা শরিয়তনিষিদ্ধ উৎকোচের শামিল।

ইমাম সারাখসী রহ. বলেন,

"ولو كفل رجل عن رجل بمال على أن يجعل له جعلا، فالجعل باطل. هكذا روى عن ابراهيم رحمه الله تعالى، وهذا لأنه رشوة، والرشوة حرام، فإن الطالب ليس يستوجب بهذه الكفالة زيادة مال، فلا يجوز أن يجب عليه عوض بمقابلته."

যদি কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির পক্ষ থেকে এই শর্তে কাফিল হয় যে, তাকে বিনিময় হিসেবে কিছু দিতে হবে, তা হলে বিনিময়ের শর্ত বাতিল সাব্যস্ত হবে। ইবরাহীম নাখায়ী রহ. থেকে এমনই বর্ণিত হয়েছে। কেননা, তা رشوة বা উৎকোচ। আর উৎকোচ হারাম। কেননা, এই কাফালা দ্বারা কাফালাপ্রার্থীর সম্পদের আধিক্য আসে না। অতএব এর বিনিময়ে তার উপর কোনো অর্থ আবশ্যক হওয়ার সুযোগ নেই।[২৩]

তবে অন্যান্য ফকিহ এই নিষেধাজ্ঞার কারণ হিসেবে (ربوا) সুদের উপস্থিতি উল্লেখ করেছেন। আল্লামা ইবনে কুদামা রহ. বলেন,

"ولو قال اقترض لى من فلان مائة، ولك عشرة، فلا بأس، ولو قال: أكفل عنى ولك ألف، لم يجز. وذلك لأن قوله: اقترض لى ولك عشرة، جعالة على فعل مباح، فجازت، كما لو قال: إبن لى هذا الحائط ولك عشرة، وأما الكفالة، فإن الكفيل يلزمه الدين، فإذا أداه وجب له على المكفول عنه، فصار كالقرض. فإذا أخذعوضا، صار القرض جارا للمنفعة، فلم يجز."

---

২৩. মাবসুতে সারাখসী, ২০: ৩২, কাফালা অধ্যায়।

> যদি কেউ বলে, 'আমার জন্য অমুক থেকে ১শ দিরহাম ঋণ এনে দাও, তোমাকে দশ দিরহাম দেওয়া হবে, তা হলে সমস্যা নেই। কিন্তু যদি বলে আমার পক্ষ থেকে কাফিল হও তোমাকে এক হাজার দিরহাম দেওয়া হবে, তা হলে তা জায়েয হবে না। কেননা প্রথম সুরতে اقترض لى ولك عشرة একটি বৈধ কাজের উপর جعالة এজন্য তা জয়েয। এটি এমন হলো, যেন কেউ বলল, এই দেয়ালটি নির্মাণ করে দাও, তা হলে দশ দিরহাম পাবে।

পক্ষান্তরে কাফালাতে কাফিলের উপর ঋণের দায় চাপে। যদি কাফিল ঋণ আদায় করে দেয় তখন যার পক্ষ থেকে সে কাফিল হয়েছে তার উপর কাফিলকে এই অর্থ পরিশোধ করা আবশ্যক হয়ে যায়। এটি সাধারণ ঋণের মতোই হলো। অতএব এই কারণে যদি সে কোনো বিনিময় গ্রহণ করে তা হলে এই ঋণ তার জন্য আর্থিক স্বার্থ হাসিলের কারণ হলো। বলাবাহুল্য, শরিয়তের দৃষ্টিতে তা অবৈধ।[২৪]

আমার البيع بالتقسيط মাকালায় কারণটি আমি ব্যাখ্যাসহ তুলে ধরেছি, যা নিম্নরূপ।

বিষয়টি একটি উদাহরণ দ্বারা আরও স্পষ্ট হবে। মনে করুন, যায়েদ আমর থেকে ১শ ডলার ঋণ নিয়েছে। এ কারণে আমর কাফিল চেয়েছে। ফলে খালেদ যায়েদকে বলল, আমি তোমার পক্ষ থেকে এখনই তোমার ঋণ আদায় করে দিচ্ছি। শর্ত হলো, তুমি পরবর্তী সময়ে আমাকে ১১০ ডলার দেবে। ১০ ডলার হলো আমি যে ডলার এখনই পরিশোধ করে দিলাম তার বিনিময় স্বরূপ। আর বকর এসে যায়েদকে বলল আমি তোমার পক্ষ থেকে তোমার ঋণের কাফিল হলাম। এ কাফালার বিনিময় স্বরূপ তুমি আমাকে ১০ ডলার দেবে। যদি আমার বাস্তবিকই ১০০ ডলার দেওয়া লাগে তা হলে তা তোমার উপর আমার ঋণ সাব্যস্ত হবে।

যারা কাফালার বিনিময়ের বৈধতার প্রবক্তা তাদের মতানুসারে উপরোক্ত উদাহরণে বকর যে বিনিময় দাবি করছে তা বৈধ। আর খালেদ যে বিনিময় দাবি করছে তা হারাম অথচ খালেদ নিজ সম্পদ ব্যয় করেছে আর বকর এখনও কিছুই ব্যয় করেনি। অবশ্য সময়মতো পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে।

---

২৪. আলমুগনী লি ইবনে কুদামা, ৪: ৩৬৫, করয অধ্যায়।

অতএব যদি বাস্তবিকপক্ষে অর্থ ব্যয় করলে পারিশ্রমিক হারাম হয় তা হলে অর্থ ব্যয়ের নিশ্চয়তা প্রদানকারীর পারিশ্রমিক আরও বেশি হারাম হওয়ার উপযোগী।

অন্যকথায় বাস্তবিকই যদি কাফিল তথা জামানত প্রদানকারীর ঋণ পরিশোধ করতে হয় তা হলে مكفول عنه তথা মূল ঋণী ব্যক্তির নিকট সে কেবল প্রদত্ত অর্থই দাবি করতে পারে। অতিরিক্ত কোনোকিছু চাওয়া জায়েয নেই। কেননা তা সুদ এবং তা কঠিন হারাম। তা হলে مكفول عنه তথা মূল ঋণী ব্যক্তির নিকট অতিরিক্ত কীভাবে দাবি করবে? যখন সে কোনো অর্থই প্রদান করেনি। বরং কেবল অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে।[২৫]

তবে ব্যাংকগুলো জামানতের বিনিময় স্বতন্ত্রভাবে নিয়ে থাকে। আর যদি বাস্তবিকই গ্রাহকের পক্ষ থেকে অর্থ পরিশোধের প্রয়োজন হয় তা হলে তার সুদ আলাদা উসুল করে থাকে। অর্থাৎ জামানতের কারণে অর্থ পরিশোধের প্রয়োজন পড়লে পৃথকভাবে সুদ দিতে হয়। কাফালা ফিয়ের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। বরং অন্যান্য ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করলে ব্যাংক যেরূপ সুদ নিয়ে থাকে এক্ষেত্রেও সুদ নেয়। কাফালা ফি প্রদত্ত ঋণের সুদের মধ্যে গণ্য হয় না। এটা জামানতেরই স্বতন্ত্র বিনিময়।

অন্যকথায় প্রচলিত রীতি হলো, জামানতের ফি কোনোক্রমেই ওই ঋণের বিনিময়ে নয়, যা ভবিষ্যতে ব্যাংকের দেওয়া লাগতে পারে। বরং এটি সকল অবস্থায় ব্যাংক নিয়ে থাকে; গ্রাহকের পক্ষ হয়ে ঋণ পরিশোধের প্রয়োজন হোক বা না হোক। যদি এলসিগ্রাহক নিজেই সমুদয় ঋণ পরিশোধ করে দেয় আর ব্যাংকের কোনো ঋণ দেওয়ার প্রয়োজন না হয়, তবু ব্যাংক এই ফি উসুল করবে। তারপর যদি ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করতেই হয় তা হলে সে প্রদত্ত ঋণের সাথে পৃথকভাবে সুদেরও দাবি করবে। কাফালাচুক্তির কারণে সে কী বিনিময় নিয়েছে তা এক্ষেত্রে দেখা হবে না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, কাফালা ফি ঋণের কারণে নয়। যদি তা ঋণের মোকাবেলায় হতো তা হলে তা সুদের অন্তর্ভুক্ত হতো। সম্ভবত একারণেই ইমাম সারাখসী রহ. কাফালার বিনিময় অবৈধ হওয়ার কারণ হিসেবে রিবার কথা উল্লেখ করেননি, বরং তিনি কাফালা ফিকে

---

২৫. বুহুস ফী কাযায়া ফিকহিয়্যা মুআসারা, ১: ২২, ২৩

رشوة তথা উৎকোচ বলেছেন। কেননা, কাফালা তো বিনিময়চুক্তিই নয়। তা শরিয়তের দৃষ্টিতে বিনিময়হীন সেবাচুক্তি।

মূলত এই উৎকোচ হওয়ার প্রতি লক্ষ্য করেই সমসাময়িক কোনো কোনো আলেম জনসাধারণের প্রয়োজনের বিষয় বিবেচনা করে জামানতের বিনিময় বৈধতার ফাতাওয়া দিয়েছেন।

মুহতারাম ভাই আল্লামা ড. ওয়াহবা যুহাইলি তার কিতাব "الفقه الاسلامى وادلته' তে বলেন,

الكفالة عقد تبرع، وطاعة يثاب عليها الكفيل، لأنها تعاون على الخير، وللكفيل الرجوع على المكفول عنه بماتحمله من مسؤولية الضمان، إذا دفعه لصالح الجهة المكفول لها، والأولى أن تتم تبرعا بدون مقابل، فذلك أبعد عن الشبهة. ولو قام المكفول له بتقديم شيء من المال للكفيل هبة أو هدية، جاز، جزاء المعروف الذى أسداه له الكفيل. لكن إن شرط الكفيل تقديم مقابل أو أجر على كفالته، وتعذر على المكفول عنه تحقيق مصلحة من طريق المحسنين المتبرعين، جاز دفع الأجر للضرورة أو الحاجة العامة، لما يترتب على عدم الدفع من تعطيل المصالح، كالسفر للخارج للدراسة أو للارتزاق، أو لتأجيل الجندية ونحوها، وأساس القول بالجواز فيه: أن الفقهاء أجازوا دفع الأجر للحاجة لأداء القربات والطاعة من تعليم قرآن وممارسة الشعائر الدينية، كما أنهم أجازوا دفع شيء من المال على سبيل الرشوة للوصل إلى الحق، أو دفع الظلم، أو الدفع لعدو لدرء خطره وضرره عن البلاد. والمكفول عنه يحقق بالكفالة منفعة له تتعين الكفالة المأجورة سبيلا عنها، لكن يجب عدم الاستغلال أو المغالاة فى اشراط المقابل، مراعاة لأصل مشروعية الكفالة وهو التبرع،

অর্থাৎ কাফালা বিনিময়হীন সেবা চুক্তি ও ইবাদত, যার বিনিময়ে কাফালা প্রদানকারী সাওয়াব পেয়ে থাকে। মূলত তা হলো কল্যাণকর কাজে অপরের সহযোগীতা করন। জামানতের কারণে কোন অর্থ ব্যয় করা হলে যার স্বার্থে কাফালা প্রদান করা হয়েছে কাফিল তার নিকট থেকে তা উসুল করে নিতে পারবে।

কাফালাচুক্তি সেবার মানসিকতা নিয়ে বিনিময়হীন করাই উত্তম। বিনিময়হীন হলে তা যাবতীয় সন্দেহ থেকে মুক্ত থাকে। পরবর্তী সময়ে যদি এ সেবামূলক কাজের কারণে কাফালাগ্রহীতা কাফিলকে কোনো জিনিস দান করে বা গিফট করে তা হলে তা জায়েয আছে। তবে যদি কাফিল কোনো বিনিময়ের শর্তারোপ করে বা কাফালার পারিশ্রমিক দাবি করে আর কাফালাগ্রহণকারী কাজে অনন্যোপায় হয়ে যায় অর্থাৎ বিনিময়হীন সেবাপ্রদানকারী কাউকে না পায় তা হলে এই অনন্যোপায়ের বিষয়টি বিবেচনা করে কিংবা সামাজিক প্রয়োজনের বিষয়বিবেচনা করে তা বৈধ হবে। কেননা, এই সুযোগ না থাকলে মানুষের কাঙ্ক্ষিত স্বার্থ ব্যাহত হবে। যেমন : উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ গমন। অনুরূপ বৈধ আরোজগারের উদ্দেশ্যে বিদেশ গমন, সমরকৌশল শেখার জন্য বিদেশ গমন ইত্যাদি।

মূলত বৈধতার বুনিয়াদ হলো, ফকিহগণ সামাজিক প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বিবেচনা করেই কতিপয় ইবাদতের বিনিময়কে বৈধ বলেছেন। যেমন : কুরআন শিক্ষা দেওয়া, দীনী শিয়ার সংরক্ষণ ইত্যাদি। অনুরূপ ক্ষেত্রবিশেষ উৎকোচ হিসেবে অর্থপ্রদানকেও ফকিহগণ বৈধ বলেছেন। নিজের প্রাপ্য হক উসুল করার জন্য, জুলুম-অত্যাচার দূর করার জন্য অথবা কোনো শত্রু প্রতিরোধকল্পে, নিজ এলাকার কোনো সমস্যা বা ক্ষতি দূরীকরণার্থে।

অতএব যেসব ক্ষেত্রে কাফালা ছাড়া নিজ স্বার্থ উদ্ধার সম্ভব নয় কাফালাগ্রহীতা ওইসব ক্ষেত্রে নিজ স্বার্থসংরক্ষণের জন্য অনন্যোপায় হয়ে বিনিময়ের ভিত্তিতে কাফালাচুক্তি করতে পারবে। যদিও মৌলিক দৃষ্টিকোণ থেকে কাফালা বিনিময়হীন সেবাচুক্তি। তবে আবশ্যক হলো, বিনিময়ের ক্ষেত্রে ব্যবসা উদ্দেশ্য না হওয়া

এবং অত্যধিক বিনিময় না হওয়া, যাতে করে কাফালার মূল দিক, বিনিময়হীন সেবার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়।[২৬]

এই মাসআলাটি বিভিন্ন সেমিনারে পেশ করা হয়েছিল। ইসলামী ফিকাহ একাডেমিতেও এব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এতে দুটি অবস্থার মাঝে পার্থক্য করা হয়েছে।

এক. গ্রাহক এলসি খোলার সময়ই কাফালা সমপরিমাণ অর্থ কাফিল তথা ব্যাংকের নিকট প্রদান করবে, যাকে ফুল মার্জিন এলসি খোলা বলে। এ সুরত হলে ইসলামী ফিকাহ একাডেমির সিদ্ধান্ত হলো, ব্যাংক উক্ত অর্থ পৌঁছানোর উকিল তথা প্রতিনিধি বিবেচিত হবে। আর এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করাও বৈধ হবে। কেননা তা وكالة এর বিনিময়, শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ।

দুই. গ্রাহক এলসি খোলার সময় ব্যাংককে কাফালার কোনো অর্থ প্রদান করবে না। বলাবাহুল্য, এই অবস্থায় এলসি কেবল জামানতই বিবেচিত হবে, যার বিনিময় জায়েয নেই। তবে এলসি খোলার বাস্তবিক ব্যয় নিতে পারবে। ইসলামী ফিকাহ একাডেমির সিদ্ধান্তের মূলপাঠ নিম্নরূপ-

"١- أن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائيّ والانتهائيّ، لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه، فان كان بدون غطاء، فهو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالا أو مآلا، وهذه هي حقيقة ما يعنى فى الفقه الاسلامي باسم: (الضمان) أو (الكفالة).

وإن كان خطاب الضمان بغطاء، فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي (الوكالة) والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيدة (المكفول له).

٢- أن الكفالة هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة، لأنه فى حالة أداء

---

২৬. আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, ৫: ১৫১, কাফালা অধ্যায়।

الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذى جر نفعا على المقرض، وذلك ممنوع شرعا.

ولذلك فإن المجمع قرر ما يلى:

أولا: أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان (والتى يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته)، سواء أكان بغطاء أم بدونه.

ثانيا: أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه فجائزة شرعا، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفى حالة تقديم غطاء كلى أو جزئي، يجوز أن يراعى فى تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء.والله أعلم."

উপরোক্ত সিদ্ধান্তের সারকথা হলো, জিরো মার্জিনে এলসি খোলা হলে এর কোনো বিনিময় নেওয়া জায়েয হবে না। তবে এলসি খুলতে বাস্তবিক যে খরচ হবে তা নেওয়া জায়েয হবে।

ফুল মার্জিন এলসির বিধান

যদি এলসিগ্রাহক এলসিতে উল্লেখিত মূল্য আগেই পরিশোধ করে দেয়, অর্থাৎ ব্যাংক যে অর্থের গ্যারান্টি দিয়েছে সে অর্থ ব্যাংককে গ্রাহক শুরুতেই পৌঁছে দেয়, যে গ্যারান্টিপত্রকে ফুল মার্জিন এলসি বলে, এক্ষেত্রে ব্যাংক এবং এলসিগ্রাহকের মাঝে কী চুক্তি হবে?

এ বিষয়ে অনুষ্ঠিত কিছু সেমিনারের সিদ্ধান্ত হলো, উভয়ের মাঝে وكالة[27] চুক্তি হবে। ব্যাংক এই وكالة এর বিনিময় গ্রাহক থেকে নিতে পারবে। কিন্তু ফুল

---

২৭. وكالة ওয়াকালা
'ওয়াকালা'র শাব্দিক অর্থ প্রতিনিধিত্ব করা। পরিভাষায় وكالة বলা হয় প্রতিনিধিত্বযোগ্য কোনো বিষয়ে কাউকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা। এক্ষেত্রে প্রতিনিধিকে وكيل 'ওয়াকিল'

মার্জিন এলসিকে স্রেফ كفالة চুক্তি বলা ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে আরও অধিক গবেষণার প্রয়োজন। এতে আরও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রয়েছে, যা আমরা নিয়ে আলোচনা করব।

ফকিহগণ উল্লেখ করেছেন, যদি مكفول عنه তথা কাফালাগ্রহীতা কাফালামূল্য পূর্বেই কাফিলের নিকট হস্তান্তর করে দেয়, অর্থাৎ কাফিলকর্তৃক কাফালামূল্য পরিশোধের পূর্বেই যদি তার নিকট কাফালামূল্য হস্তান্তর করা হয় তা হলে দুই অবস্থা হতে পারে।

اقتضاء পদ্ধতিতে এলসিমূল্য উসুল করার বিধান

প্রথম অবস্থা হলো, কাফিল مكفول عنه থেকে اقتضاء পদ্ধতিতে তথা স্বীয় প্রাপ্য উসুলকরণের ভিত্তিতে কাফালামূল্য গ্রহণ করা। اقتضاء পদ্ধতি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কাফিলকর্তৃক ঋণদাতার ঋণ পরিশোধের পূর্বেই مكفول عنه তথা দায়গ্রস্ত ব্যক্তি থেকে কাফালাভিত্তিক পাওনা উসুল করে নেবে।

আর দ্বিতীয় পদ্ধতিকে رسالة পদ্ধতিতে অর্থ গ্রহণ বলে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, مكفول عنه তথা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি কাফিলকে ঋণ পৌঁছানোর প্রতিনিধি বানিয়েছে। সে প্রতিনিধিস্বরূপ ঋণদাতার নিকট অর্থ পৌঁছাবে।

যদি اقتضاء-পদ্ধতিতে কাফিল অর্থ গ্রহণ করে তা হলে হানাফী ফকিহদের অভিমত অনুযায়ী সে এই অর্থের মালিকানা লাভ করবে। ফিকহে মালেকী অনুযায়ীও বাহ্যত সেরূপ। এই অর্থের দায় কাফিলের উপর বর্তাবে। যদি তার হাতে এই অর্থ খোয়া যায় তা হলে সে জামিন হবে। অর্থাৎ ঋণদাতার নিকট সেই পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করা তার উপর আবশ্যক হবে। আর যদি ঋণদাতা ঋণগ্রহীতাকে ক্ষমা করে দেয় তা হলে এই টাকা مكفول عنه কে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। তা ছাড়া যদি এই অর্থ নগদ ক্যাশ হয় আর কাফিল ঋণ পরিশোধের পূর্বে এর দ্বারা লাভবান হয় তা হলে এ মুনাফা তারই হবে। ফিকহে হানাফীতে এ কথার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। ফিকহে মালেকীর মূলনীতির আলোকেও তাই হবে। ফিকহে শাফেয়ীর এক বর্ণনা অনুযায়ীও তাই হবে।

বলা হয়, আর যার পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করা হচ্ছে তাকে أصيل 'আসিল' বা مؤكل 'মুয়াক্কিল' বলে। অনুবাদক।

এই বিষয়ে ফিকহে হানাফীর সিদ্ধান্ত আমরা হেদায়া গ্রন্থকারের ইবারত থেকে উল্লেখ করব। সাথে বন্ধনীতে কিছু ব্যাখ্যাও পেশ করব, যা মূলত হেদায়ার বিভিন্ন ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

"ومن كفل عن رجل بألف عليه بأمره، فقضاه (يعنى قضى المديون الكفيل) قبل أن يعطيه (يعنى قبل أن يطي الكفيل المال) صاحب المال(يعنى الدائن المكفول له) فليس له أن يرجع فيها(يعنى ليس للمديون أن يسترد ما دفعه الى الكفيل) لأنه تعلق به حق القابض(يعنى الكفيل) على احتمال قضاء الدين(يعنى أن الكفيل إذا ادى الدين إلى الدائن بحكم الكفالة، فإنه يحق له أن يمسك هذاالمبلغ الذى قبضه من المكفول عنه، فتعلق به حقه لهذاالاحتمال) فلا تجوز المطالبة (لايجوز للمديون أن يطالب باسترداد هذا المبلغ من الكفيل) ما بقى هذاالاحتمال، كمن عجل زكاته ودفعها إلى الساعى (فلا يجوز له الاسترداد قبل تمام الحول، لأنه تعلق به حق الساعى لاحتمال أن يتم الحول) ولأنه ملكه بالقبض على مانذكر (وهو أنه حصل للكفيل حق مطالبة المديون بمجرد الكفالة، وإن كانت المطالبة أجلت إلى أن يدفع الكفيل الدين إلى الدائن، فصار كدينه المؤجل على المديون. ولو أدى المديون الدين المؤجل قبل حوله، ملكه الدائن، فكذا إذا عجل المديون إلى الكفيل.)

কেউ যদি কোনো লোকের পক্ষ থেকে তার নির্দেশে তার যিম্মায় সাব্যস্ত এক হাজার দিরহামের কাফালা বা দায় গ্রহণ করে, আর কাফিল পাওনাদারকে টাকা পরিশোধ করার পূর্বে দেনাদার কাফিলকে ওই এক হাজার প্রদান করে, তা হলে দেনাদার ব্যক্তি তা ফেরত চাইতে পারে না।

কেননা (এক হাজার দিরহাম) কবজাকারী কাফিল ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছে, এই সম্ভাবনার ভিত্তিতে প্রদত্ত অর্থের সাথে তার হক যুক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং এই সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় ফেরত দাবি করা জায়েয হবে না। যেমন : কেউ (বর্ষপূর্তির পূর্বে) আগেভাগে যাকাত আদায় করল এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত উসুলকারীর কাছে তা প্রদান করল। তা হলে সে আর বর্ষপূর্তির পূর্বে যাকাত উসুলকারী থেকে এই অর্থ ফেরত নিতে পারবে না। কেননা বর্ষপূর্তির সম্ভাবনার ভিত্তিতে এর সাথে যাকাত উসুলকারীর হক যুক্ত হয়ে গেছে।

তা ছাড়া সে তো দখল গ্রহণের মাধ্যমে উক্ত মালের মালিক হয়ে গেছে, যেমন : পরবর্তী সময়ে আমরা তা উল্লেখ করব। অর্থাৎ কাফিল কাফালার কারণেই ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি থেকে মাল দাবি করার অধিকার পেয়ে থাকে। যদিও কাফিলকর্তৃক ঋণদাতাকে অর্থ পরিশোধ পর্যন্ত সাধারণত এই দাবি বিলম্বিত হয়। ফলে তা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির মেয়াদি ঋণের মতো হলো। যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি মেয়াদপূর্তির পূর্বে স্বীয় ঋণ আদায় করে দেয়, তা হলে ঋণদাতা অবশ্যই সেই অর্থের মালিকানা লাভ করবে। অনুরূপ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি কাফিলের নিকট পূর্বেই অর্থ পরিশোধ করে দিলে কাফিলও তার মালিকানা স্বত্ব লাভ করবে।

ফিকহে মালেকীর বিষয়টি المدونة الكبرى গ্রন্থে এসেছে। সেখানে বলা হয়েছে,

"قلت: أرأيت لو أن رجلا تكفل بمال عليّ، فدفعته إلى الكفيل، فضاع من الكفيل، أيكون الكفيل فيه مؤتمنا، أم يكون ذلك اقتضاء؟ قال: لم أسمع من مالكٍ فيه شيئا. قال: وأرى إذا كان ذلك من الكفيل على وجه الاقتضاء منه له، فأراه من الكفيل. قلت: عروضا كانت الكفالة أو ذهبا، أو ورقا، أو غير ذلك، فكل ذلك سواء؟ قال: نعم."

আমি বললাম, আপনার কী অভিমত, যদি কোনো ব্যক্তি আমার যিম্মায় সাব্যস্ত অর্থের কাফিল হয়, দায়ভার গ্রহণ করে আর আমি কাফিলের নিকট সে অর্থ হস্তান্তর করি, তারপর তা কাফিলের নিকট নষ্ট হয়ে যায়, এক্ষেত্রে কাফিল কি শুধু আমানতদার বিবেচিত হবে? না তা اقتضاء পদ্ধতিতে হবে, অর্থাৎ স্বীয় প্রাপ্য উসুল করেছে- এই ভিত্তিতে হবে? তিনি বললেন, এব্যাপারে আমি ইমাম মালেক রহ. থেকে কিছু শুনিনি। তবে আমার অভিমত হলো, যদি কাফিল তা اقتضاء পদ্ধতিতে গ্রহণ করে থাকে তা হলে তা কাফিলের ক্ষতি সাব্যস্ত হবে। আমি বললাম, কাফালাকৃত বস্তু পণ্য, সোনা-চাঁদি যাই হোক, সবধরনের বস্তুর বিধান কি একই? তিনি বললেন, হ্যাঁ।[২৮]

আর ফিকহে শাফেয়ীর বিষয়টি ইমাম নববী রহ. উল্লেখ করেছেন,

ولو دفعه الأصيل ابتداء بلا مطالبة، فإن قلنا يملكه، فله التصرف فيه، كالفقير إذا أخذ الزكاة المعجلة، لكن لا يستقر ملكه عليه، بل عليه رده، ولو هلك عنده، ضمنه كالمقبوض بشراء فاسد.

যদি 'আসিল' তথা মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি কোনো প্রকার দাবি ছাড়াই কাফিলকে মাল হস্তান্তর করে দেয়, এক্ষেত্রে যদি আমরা বলি যে, সে মালিকানা স্বত্ব লাভ করবে, তা হলে সে এই মালে যেকোনো প্রকার তসরুপ করতে পারবে। যেমন : যাকাতের কোনো হকদার ব্যক্তি অগ্রিম যাকাত গ্রহণ করছে। কিন্তু এ মালিকানা স্থায়ী হবে না। প্রয়োজনে তা ফেরত দেওয়া আবশ্যক হবে। আর যদি তার নিকট এই মাল নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে সে এই মালের জামিন হবে। ফাসেদ বিক্রির ভিত্তিতে গ্রহণ করলে যেরূপ জামিন হয়ে থাকে।[২৯]

---

২৮. আল মুদাওওয়ানাতুল কুবরা, কিতাবুল কাফালা, ৪: ১২১, ১২২

২৯. রওযাতুত তালেবীন, যামানা অধ্যায়, ৪: ২৬৫

অতএব যদি এলসি গ্রাহক اقتضاء পদ্ধতিতে ব্যাংককে অর্থ পরিশোধ করে দেয়, ব্যাংকিং লেনদেনে বাহ্যত এরূপই হয়ে থাকে, তা হলে এলসিমূল্য পূর্ব প্রদানের কারণে বিষয়টি وكالة য় রূপান্তরিত হবে না। বরং বাস্তবতা হলো, ব্যাংককর্তৃক ঋণদাতাকে অর্থ পরিশোধ করা হলে গ্রাহকের দায়ে যা আবশ্যক হবে তা পূর্বেই আদায় করে দেওয়া হচ্ছে।

অতএব وكالة এর ভিত্তিতে এর বিশ্লেষণ تكييف সহীহ নয়। বরং এটি কেবলই জামানত। ব্যাংক এই অর্থ বিনিয়োগ করে কোনো মুনাফা অর্জন করলে তা বৈধ। তবে এই প্রক্রিয়ায় ব্যাংক যে ফি নিয়ে থাকে তাতে সুদের সন্দেহ নেই। কেননা, এই অবস্থায় ব্যাংক গ্রাহককে কোনো ঋণ দেয়নি।

অতএব ঋণকে কেন্দ্র করে অতিরিক্ত নেওয়া হচ্ছে- একথা বলার সুযোগ নেই। তাই সমুদয় অর্থ এলসিকার্যক্রম নির্বাহবাবদ গণ্য করা যাবে। যেমনটি ইনশাআল্লাহ আলোচনা হবে।

رسالة পদ্ধতিতে অর্থ গ্রহণ

দ্বিতীয় সুরত হলো, কাফিল এলসিতে উল্লেখিত মূল্য رسالة-পদ্ধতি তথা প্রতিনিধিস্বরূপ গ্রহণ করবে। এই অবস্থায় অবশ্য এই চুক্তিকে وكالة চুক্তি বলা যেতে পারে। কেননা, গ্রাহক তার ঋণদাতাকে এ টাকা পৌঁছানোর জন্য ব্যাংককে প্রতিনিধি বানিয়েছে। ফকিহগণ তা বৈধ বলেছেন। তবে শর্ত হলো, গ্রাহকপ্রদত্ত অর্থ কাফিলের হাতে আমানতস্বরূপ থাকবে। ইমাম নববী রহ. বলেন,

> ولو دفعه إليه وقال: اقض ما ضمنت عنى، فهو وكيل الأصيل، والمال أمانة فى يده.
>
> যদি তার নিকট টাকা হস্তান্তর করে বলে, 'আমার পক্ষ থেকে তুমি যে জামানত গ্রহণ করেছ তা পরিশোধ করে দাও', তা হলে সে মূল ব্যক্তির প্রতিনিধি গণ্য হবে। আর অর্থ তার হাতে আমানতস্বরূপ থাকবে।[৩০]

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব, 'আলহেদায়া'-এর গ্রন্থকার اقتضاء পদ্ধতিতে অর্থগ্রহণের বিধান আলোচনার পর বলেন,

---

৩০. রওযাতু তালেবীন, ৪: ২৬৫, জামানত অধ্যায়।

بخلاف ما إذاكان الدفع على وجه الرسالة، لأنه تمحض أمانة في يده.

তবে বিপরীত হলো যদি প্রতিনিধিস্বরূপ অর্থ দেওয়া হয় তা হলে তা স্রেফ তার হাতে আমানতস্বরূপ থাকবে।

আল্লামা বা-বরতী রহ. ইবারতের টীকায় বলেন,

وإذا قبضه على وجه الرسالة، فالربح لا يطيب له في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهماالله تعالى، لأنه ربح من أصل خبيث. وفي قول أبي يوسف يطيب، لأن الخراج بالضمان. أصله المودع إذاتصرف في الوديعة وربح، فإنه على الاختلاف.

যদি সে প্রতিনিধিস্বরূপ অর্থগ্রহণ করে তা হলে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর অভিমত অনুযায়ী এই অর্থের মুনাফা তার জন্য বৈধ হবে না। কেননা, মূল অর্থ তো তার জন্য ব্যবহার বৈধ নয়। এর প্রফিট কীভাবে বৈধ হবে।

তবে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর অভিমত অনুযায়ী মুনাফা ভোগ করা বৈধ। কেননা, الخراج بالضمان 'মুনাফা ভোগ করা দায়গ্রহণের উপর নির্ভরশীল'। মূলত এই মাসআলার ভিত্তি হলো, গচ্ছিত জিনিসে যদি কেউ তসরুপ করে লাভবান হয় তা হলে তাতে মতভেদ আছে। একারণে উল্লেখিত মাসআলায়ও মতভেদ রয়েছে।

এখন যদি বলা হয়, ব্যাংক তো এলসিমূল্য প্রতিনিধি হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। কেননা, ঋণগ্রহীতা এই অর্থ ঋণদাতার নিকট পৌছানোর জন্য ব্যাংককে প্রতিনিধি বানিয়েছে। তা হলে এই অর্থ ব্যাংকের নিকট আমানত হিসাবে থাকবে।

কিন্তু বিষয় হলো, আল্লামা বা-বরতী রহ. এর কথা ছিল ঋণগ্রহীতার অনুমতিবিহীন যদি কাফিল তাতে তসরুপ করে, সে সম্পর্কে। কেননা, সেই তসরুপ غصب (গসব) সাব্যস্ত হয়। পক্ষান্তরে যদি ঋণগ্রহীতার অনুমতি-ক্রমে তা নিজের সম্পদের সাথে মিলিয়ে ফেলা হয় তা হলে কাফিলের সাথে তা شركة الملك তথা মালিকানা স্বত্বের অংশীদারিত্বে রূপান্তরিত হবে।

অতএব এক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে মুনাফা বণ্টন হওয়া উচিত এবং এলসিমূল্য কাফিলের জামানতে না হওয়া উচিত।

অতএব ব্যাংকের নিকট হস্তান্তরকৃত এলসিমূল্য যদি رسالة বা প্রতিনিধিত্বের প্রক্রিয়া অবলম্বন করে হয় এবং গ্রাহকের পক্ষ থেকে অন্যান্য অর্থের সাথে মিলানোর অনুমতি থাকে তা হলে এই বিশ্লেষণ সম্ভব যে, প্রথমত তা আমানত হবে, শেষে তা শিরকাত হবে। ব্যাংক স্বীয় অর্থের সাথে এই অর্থ মিলিয়ে ফেলার কারণে শিরকাত হবে। আর যদি আমরা মেনে নিই যে, গ্রাহক তা মিলিয়ে নেওয়ার অনুমতি দেয়নি তা হলে শুরুতে তা আমানত হবে আর শেষে তা জামানত হবে।

বাহ্যত মনে হয়, সকলেই যেহেতু জানে, ব্যাংক এই টাকা নিজ টাকার সাথে মিলিয়ে ফেলবে এবং তাতে তসরুপ করবে, অতএব একথা জানা সত্ত্বেও এলসিমূল্য তাকে হস্তান্তর করার অর্থই হলো তার পক্ষ থেকে তসরুপের অনুমতি থাকা। অর্থাৎ জ্ঞাতসারে এভাবে দেওয়াই তার পক্ষ থেকে অন্যান্য মালের সাথে মিলিয়ে বিনিয়োগের অনুমতি প্রদান করা বিবেচিত হবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, শুধু জানা থাকা অনুমতি সাব্যস্ত হবে না। কেননা, যে ব্যক্তি ব্যাংককে এলসিমূল্য প্রদান করে সে এ বিষয়ে সন্তুষ্ট হবে না যে, ব্যাংক তাতে শরিকানা ব্যবসা করবে এবং তার উক্ত অর্থ ব্যাংকের জামানতে থাকবে না। যদি সে জানতে পারে এই অর্থ ব্যাংকের জামানতে থাকবে না তা হলে সে অনুমতি দেবে না।

বাস্তব কথা হলো, ব্যাংকের পক্ষ থেকে তা মিলিয়ে ফেলা এবং তাতে তসরুপ করা গ্রাহকের অনুমতিক্রমে নয় বরং গ্রাহক এই অর্থ যেন করয বা ঋণ হিসেবে ব্যাংককে প্রদান করেছে। আর এই অবস্থায় যে ফি নেওয়া হচ্ছে, তা ডাকযোগে অর্থ প্রেরণের ফিয়ের সাথে সাদৃশ্যশীল। যেমনটি আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে, তা ব্যবস্থাপনাগত কার্যক্রমের বিনিময় রূপে, যা ব্যাংক আনজাম দিয়ে থাকে।

উপরোক্ত দীর্ঘ আলোচনা দ্বারা একথাই প্রতীয়মান হলো যে, কার্যক্রমে এলসি ব্যাংক যে ফি নিয়ে থাকে, তা উভয় বিশ্লেষণ অনুযায়ীই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের বিনিময়, যা ব্যাংক আনজাম দিয়ে থাকে। ফলে এ ধরনের কাজের সাধারণত যে পরিমাণ বিনিময় হয়ে থাকে তার সে পরিমাণই হওয়া উচিত। জিরো

মার্জিন এলসির আলোচনায় আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করব, ইনশাআল্লাহ।

এখানে আরেকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। তা হলো, সুদিব্যাংকগুলো এলসিপ্রার্থীকর্তৃক প্রদত্ত অর্থ অবৈধপন্থায় বিনিয়োগ করে থাকে। তারা এ অর্থ সুদভিত্তিক ঋণ দিয়ে থাকে। তবে এর দায়দায়িত্ব ব্যাংকের। আর ইসলামী ব্যাংকগুলোর গ্রাহককে এই অধিকার দেওয়া উচিত যে, হয়তো গ্রাহক তা করয হিসেবে দেবে আর ব্যাংক শরিয়তসম্মত কোনো বিনিয়োগপদ্ধতি ব্যবহার করে তার দ্বারা উপকৃত হবে। মূল অর্থ ব্যাংকের জামানতে থাকবে। ব্যাংকের জন্য এই মুনাফা হালাল হবে। অথবা ব্যাংক তা গ্রাহকের মুদারাবা একাউন্টে রেখে দেবে। তা হলে মুনাফা নির্ধারিত হারে বণ্টিত হবে আর লস হস্তান্তরকৃত অর্থ সমপরিমাণ গ্রাহকের উপরই বর্তাবে।

জিরো মার্জিন এলসি

পক্ষান্তরে এলসি যদি জিরো মার্জিনে হয় তা হলে তা কেবলই কাফালা। এক্ষেত্রে ইসলামী ফিকাহ একাডেমি জমহুর আলেমের অভিমত অনুযায়ী এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, এর ফি নেওয়া নাজায়েয।

তবে কথা হলো শুধু জামানত বা কাফালা প্রদানের ফি নাজায়েয। জামানত বিনিময়হীন সেবা হওয়া আবশ্যক। কিন্তু প্রত্যয়নপত্র তৈরি করে তা ইস্যু করা এটা কাফিলের আবশ্যক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত নয়। এই প্রত্যয়নপত্র লেখা এবং তা ইস্যু করা বিনিময়হীন হওয়া আবশ্যক নয়। কাফিল এই কাজগুলোর বিনিময় দাবি করতে পারে। তবে এই বিনিময় এ ধরনের কাজের বাজারমূল্য অতিক্রম করতে পারবে না। ফলে এই ফি এলসিতে উল্লেখিত অর্থের পরিমাণের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারবে না।

এখানে যদি বলা হয়, আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী রহ. নথি লেখার বিনিময়ের ক্ষেত্রে যা বলেছেন, তা তো এখানে প্রযোজ্য হওয়া উচিত। আল্লামা শামী বলেন,

"للقاضى أن يأخذ ما يجوز لغيره، وما قيل: فى كل ألف خمسة دراهم لانقول به، ولا يليق ذلك بالفقه. وأى مشقة للكاتب فى كثرة الثمن، وإنما أجر مثله بقدر مشقته، أوبقدر عمله فى

صنعته أيضا، كحكاك وثقاب يستأجر بأجر كثير في مشقة قليلة.
انتهى. قال بعض الفضلاء: أفهم ذلك جواز أخذالأجرة الزائدة،
وإن كان العمل مشقته قليلة. ونظرهم لمنفعة المكتوب له. انتهى.
قلت: ولايخرج ذلك عن أجرة مثله، فإن من تفرغ لهذاالعمل،
كثقاب اللآلى مثلا لايأخذ الأجر على قدر مشقته، فإنه لا يقوم
بمؤنته، ولو ألزمناه ذلك، لزم ضياع هذه الصنعة. فكان أجر مثله."

বিচারপতি এ পরিমাণ নিতে পারবে, যে পরিমাণ অন্যদের জন্য নেওয়া বৈধ। আর যা বলা হয়েছে, প্রত্যেক হাজারে পাঁচ দিরহাম নেবে, আমরা তা বলি না। এ কথাটি ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক নয়। মূল্যের পরিমাণ বেশি হলে লেখকের এতে আলাদা কী কষ্ট? কষ্ট ও পরিশ্রম হিসেবে পারিশ্রমিক নির্ধারিত হয়ে থাকে। অনুরূপ কারিগরি দক্ষতা হিসেবেও পারিশ্রমিক নির্ধারিত হয়। যেমন, حكاك স্বর্ণ যাচাইকারী ও মুক্তা ছেদনকারী অল্প কষ্টের কাজে অধিক পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে (সমাপ্ত)। কোনো কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন, এর দ্বারা বুঝা যায়, কোনো কাজে কষ্ট কম হলেও যদি তার উপকারিতা বেশি হয় তা হলে সে কাজে অধিক পারিশ্রমিক নেওয়া বৈধ। (সমাপ্ত)। (আল্লামা শামী রহ. বলেন,) আমি বলি, তা সত্ত্বেও তা ওইকাজের বাজারমূল্যের অধিক হবে না। তবে কথা হলো, যে এই কাজের জন্য নিজেকে নিয়োগ করবে, যেমন হীরা-মুক্তা ছেদনকারী, সে কেবল শ্রম হিসেবে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে না। কেননা, এতে তার ব্যয়নির্বাহ হবে না। আমরা যদি শ্রম হিসেবে পারিশ্রমিক আবশ্যক করে দিই তা হলে দক্ষতার এই পেশা ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই অন্যান্য কাজের পারিশ্রমিকের তুলনায় অধিক পারিশ্রমিকই তার বাজারমূল্য।[৩১]

ডাকযোগে অর্থ প্রেরণের মাসআলাতেও আমরা এবিষয়ে আলোচনা করেছি।

---

৩১. রদ্দুল মুহতার, ইজারা অধ্যায়: ৬: ৯৬

(শায়খুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী বলেন,) কিন্তু একথা স্পষ্ট যে, এ বিষয়টি কেবল সেসব ক্ষেত্রেই চলতে পারে, যেখানে উক্ত বিষয় সুদ পর্যন্ত গড়াবে না। অন্যথায় ঋণদাতা বলবে, আমার দায়িত্ব হলো ঋণ দেওয়া, লোন ইস্যু করার যাবতীয় কার্যক্রম আনজাম দেওয়া, ঋণের ডকুমেন্ট তৈরি করা, এগুলো আমি বিনিময়হীন সেবামূলক করব না। আমি ডকুমেন্ট তৈরী এবং প্রাতিষ্ঠানিক যাবতীয় কার্যনির্বাহের পারিশ্রমিক নেবো। এবং তা ঋণের পরিমাণের সাথে সংযুক্ত করে নেবো। ঋণের পরিমান বেশি হলে আমার পারিশ্রমিকও বৃদ্ধি পাবে।

এমন বক্তব্যের অসারতা তো স্পষ্ট। অতএব ঋণের ডকুমেন্ট লেখার পারিশ্রমিক ঋণের পরিমাণের সাথে যুক্ত করে দেওয়ার কোন সুযোগ নেই। অতএব, ঋণের পরিমাণ বেশি বিধায় পারিশ্রমিক বেশি, এ কথা হীরা-মুক্তা ছেদনকারীর পারিশ্রমিকের উপর ভিত্তি করে বলা কোনোক্রমেই জায়েয হবে না। কেননা, এর দ্বারা সুদ গ্রহণ আবশ্যক হয়ে যাবে।

মূলত যুক্তির কথা হলো, এলসি ফির বিষয়টি জামানতের বিনিময় অবৈধ হওয়ার কারণ নির্ধারণের উপর নির্ভরশীল। যদি অবৈধ হওয়ার কারণ হয় সুদ আবশ্যক হওয়া, তা হলে এলসি ফি জামানতকৃত মূল্যের সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়া জায়েয হবে না।

আর যদি অবৈধ হওয়ার কারণ رشوة তথা উৎকোচ হয়ে থাকে, কেননা, জামানতের চুক্তি বিনিময়হীন সেবাচুক্তি, যেমনটি ইমাম সারাখসী রহ. উল্লেখ করেছেন। তা হলে বিচারপতির নথি লেখার পারিশ্রমিকের সাথে এর তুলনা করা যাবে। আমরা ইতোপূর্বে তা আলোচনা করেছি।

বর্তমানে প্রচলিত রীতির আলোকে একথা স্পষ্ট যে, দ্বিতীয় কারণ তথা رشوة এর বিষয়টি অগ্রাধিকারযোগ্য। কেননা, যখন এলসি ফি পরিশোধ করা হয় তখন গ্রাহকের উপর ব্যাংকের কোনো ঋণ থাকে না। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি, এলসি ফির ক্ষেত্রে প্রচলন এটা নয় যে, গ্রাহকের পক্ষ থেকে ব্যাংক যা পরিশোধ করবে তার বিনিময়। কেননা, ব্যাংক তা সকল অবস্থায় নিয়ে থাকে। গ্রাহক যদি ঋণ নিজেই পরিশোধ করে আর ব্যাংককর্তৃক ঋণদাতাকে কোনো অর্থ দেওয়ার প্রয়োজন না পড়ে তা হলেও ব্যাংক এই ফি গ্রহণ করে থাকে।

আর যদি ব্যাংককর্তৃক কোনো অর্থ দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে তা হলে ব্যাংক এই কারণে স্বতন্ত্র হারে সুদ নিয়ে থাকে। কাফালার বিনিময়ে যে ফি নেওয়া হয়েছে তা এতে ধর্তব্য হয় না। তো কথা পরিষ্কার, এলসি ফি ঋণের বিনিময় বা ঋণের কারণে নয়, যে তাকে সুদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হবে।

সম্ভবত একারণেই ইমাম সারাখসী রহ. কাফালা ফি অবৈধ হওয়ার কারণ সুদ বলেননি। বরং তিনি নিষিদ্ধতার কারণ رشوة বা উৎকোচ বলেছেন। কেননা, শরিয়তের দৃষ্টিতে কাফালা বিনিময়হীন সেবাচুক্তি عقد تبرع। এটি বিনিময় চুক্তি নয়। আর এই কারণে হলে জামানতের মাসআলা, বিচারপতি ও মুফতি সাহেবের পারিশ্রমিকের মাসআলার সাথে মিলে যাবে। কেননা, বিচার করা এবং ফাতোয়া দেওয়া উভয়টি মূলত বিনিময়হীন স্বেচ্ছাসেবা। এগুলোর বিনিময় নাজায়েয। তবে বিচারকার্য নথিবদ্ধ করা এবং ফাতোয়া লিখে দেওয়া, এসব কাজের বিনিময় বৈধ। অবশ্য তা বাজারমূল্য হিসেবে হতে হবে। আর বিচারকার্য নথিবদ্ধ করার পারিশ্রমিক পরিমাণের সাথে যুক্ত করা যাবে; মুক্তা ছেদনকারীর পারিশ্রমিকের উপর ভিত্তি করে। যেমনটি আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী রহ.এর লেখা ইবারত দ্বারা বুঝা যায় (তবে তা একাজের বাজারমূল্য অপেক্ষা বেশি হতে পারবে না)। আপতত এটাই আমার নিকট প্রতিভাত হচ্ছে।

আমি এবিষয়টি এখানে বিস্তারিতভাবে পেশ করলাম, যাতে করে এবিষয়ে সমসাময়িক আলেমগণ ফিকির করেন, গবেষণা চালান। কেননা, এ দৃষ্টিকোণ থেকে মাসআলা বড়োই গুরুত্বপূর্ণ যে, জামানতের বিনিময় অবৈধ হওয়ার বিষয়টিতে উম্মতের ঐকমত্য কিংবা তা প্রায়ঐকমত্যপুষ্ট বিষয়।

অন্যদিকে বর্তমান ব্যবসাবাণিজ্যে জামানতের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সেবামূলক কাফালার দ্বারা সে প্রয়োজন পূর্ণ হবে না।

বিষয়টি গভীর গবেষণার দাবি রাখে এবং উভয়দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। আল্লাহই অধিক জানেন। তিনি সঠিক বিষয়ের তাওফিকদাতা।

এলসির অন্যান্য কার্যক্রম

উপরোক্ত আলোচনা কাফালা-জামানতকেন্দ্রিক ছিল। এলসি ওপেনিংয়ে যদিও সর্বাধিক গুরুত্ববহ কাজ জামানত, কিন্তু এতে অন্যান্য কাজেরও সমাবেশ রয়েছে। যেমন : প্রত্যায়নপত্র তৈরি করা, এলসিগ্রাহকের কাঙ্ক্ষিত শর্তাবলির

বিবরণ পেশ করা, বেনিফিশিয়ারি বা তার ব্যাংকের নিকট এলসি প্রেরণ করা, অ্যাডভাইজিং ব্যাংকের সাথে ডকুমেন্ট আদানপ্রদান করা, শিপিং ডকুমেন্ট হস্তগত করা এবং তা যাচাই-বাছাই করে দেখা যে, তা কাঙ্ক্ষিত শর্ত ও গুণাবলি (যেগুলোর আলোকে এলসি খোলা হয়েছে সে) অনুযায়ী আছে কি না, গ্রাহককে ডকুমেন্ট হস্তগত হওয়ার সংবাদ দেওয়া এবং তার থেকে প্রাপ্তির স্বাক্ষর নেওয়া, বেনিফিশিয়ারি বা তার ব্যাংকের নিকট মূল্য প্রেরণ করা, ডকুমেন্ট কাঙ্ক্ষিত শর্ত ও গুণাবলি অনুযায়ী হলে তা বিক্রেতা বা তার ব্যাংককে অবহিত করা, ক্রেতা-বিক্রেতার পক্ষ থেকে নির্দেশনা আসা পর্যন্ত ডকুমেন্ট সংরক্ষণ করা।

এলসিচুক্তিতে কাফালার সাথে অন্যান্য কাজও রয়েছে, যেগুলো গ্রাহকের স্বার্থে ব্যাংক আনজাম দিয়ে থাকে। এগুলোর কিছু কাজ তো ব্যাংক ক্রেতার প্রতিনিধি হিসেবে আনজাম দিয়ে থাকে। যেমন : ডকুমেন্ট হস্তগত করা এবং তা যাচাই-বাছাই করা। আর কিছু কাজ উভয়ের স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যাংক আনজাম দিয়ে থাকে। যেমন : বেনিফিশিয়ারি বা তার ব্যাংকের সাথে ডকুমেন্ট আদানপ্রদান। এগুলো এমন সেবাকার্যক্রম, যার বিনিময় বৈধ। এলসি ফি নির্ধারণে এসব কাজের দখল রয়েছে। আর এগুলো শরিয়তের দৃষ্টিতে জায়েয।

এলসি-কার্যক্রমে মার্জিনের শরয়ী تكييف বিশ্লেষণ

উপরোক্ত আলোচনার সম্পর্ক ছিল যদি এলসি-কার্যক্রম জিরো মার্জিন বা আংশিক মার্জিনে খোলা হয়। পক্ষান্তরে এলসি যদি ফুল মার্জিনে খোলা হয় (with full Margin) অর্থাৎ এলসিগ্রাহক এলসিতে উল্লেখিত পূর্ণ মূল্য পূর্বেই ব্যাংককে পেমেন্ট করে দেয়, তা হলে যে প্রশ্নগুলো ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যবসাবাণিজ্যের আলোচনায় আমরা নির্ধারণ করেছিলাম তার মাঝে পঞ্চম প্রশ্নের সমাধান করতে হবে। প্রশ্নটি হলো গ্রাহকের পক্ষ থেকে ব্যাংককে এলসিমূল্য আগেই পরিশোধ করা হলে তার শরয়ী অবস্থান কী হবে?

এই প্রশ্নের সমাধান হলো, এলসির মার্জিন হিসাবে যে-অর্থ ব্যাংক গ্রহণ করে থাকে, অর্থাৎ গ্রাহকপ্রদত্ত অর্থ, এতে এলসি মার্জিন সম্পর্কে আমরা যে বিস্তারিত আলোচনা করেছি তা-ই প্রযোজ্য হবে। হয়তো মূল পাওনাদারকে পরিশোধের পূর্বে ব্যাংকের নিকট তা اقتضاء পদ্ধতির ভিত্তিতে থাকবে, অথবা তা رسالة পদ্ধতি অর্থাৎ বিক্রেতার নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত তা আমানতস্বরূপ থাকবে।

উভয় অবস্থা সম্পর্কেই আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তা ছাড়া ব্যাংক ফি হিসেবে যা নিয়ে থাকে, সে সম্পর্কেও আলোচনা করেছি।

অ্যাডভাইসিং ব্যাংক ও তার ফি

ষষ্ঠ প্রশ্ন হলো, অ্যাডভাইজিং ব্যাংকের কার্যক্রমের শরয়ী বিশ্লষণ কী?

মূলত অ্যাডভাইজিং ব্যাংকের প্রয়োজন এজন্য দেখা দেয় যে, সাধারণত এলসির বেনিফিশিয়ারি ইস্যুয়িং ব্যাংকের দেশে অবস্থানকারী লোক হয় না। সাধারণত সে বিদেশে অবস্থানকারী লোক হয়। তো ইস্যুয়িং ব্যাংকের জন্য যদিও এটা সম্ভব যে, সে সরাসরি বেনিফিশিয়ারির সাথে যোগাযোগ করবে কিন্তু বেনিফিশিয়ারির দেশীয় কোনো প্রসিদ্ধ ব্যাংকের মাধ্যমে যোগাযোগ করা তার জন্য সহজ হয়। বেনিফিশিয়ারির দেশীয় ওই ব্যাংককে আরবিভাষায় البنك المراسل ইংরেজিভাষায় অ্যাডভাইজিং ব্যাংক বলে।

ইস্যুয়িং ব্যাংক অ্যাডভাইজিং ব্যাংককে এই মর্মে সংবাদ দেয় যে, আমদানিকারকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তার নিকট বিক্রেতার স্বার্থে উল্লেখিত শর্তসাপেক্ষে এলসি খোলা হয়েছে। তখন এই অ্যাডভাইজিং ব্যাংক বিক্রেতা- বেনিফিশিয়ারিকে এ সম্পর্কে অবহিত করে যে, অমুক দেশের অমুক ব্যাংক তার স্বার্থে এলসি খুলেছে। সাথে সাথে এলসির শর্তাবলি সম্পর্কেও অবহিত করে। তারপর বিক্রেতা যখন পণ্য শিপমেন্ট করে তখন অ্যাডভাইজিং ব্যাংকই তার থেকে শিপিং ডকুমেন্ট বুঝে নেয় এবং তা ইস্যুয়িং ব্যাংকের নিকট পাঠিয়ে দেয়। البنك المراسل বা অ্যাডভাইজিং ব্যাংকের কার্যক্রম মূলত আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে ইস্যুয়িং ব্যাংকের এজেন্টস্বরূপ হয়ে থাকে। অতএব অ্যাডভাইজিং ব্যাংক যে ফি নিয়ে থাকে তা وكالة, চুক্তির ভিত্তিতে প্রদত্ত সেবার বিনিময়। বলাবাহুল্য, শরিয়তের দৃষ্টিতে তা বৈধ।

তবে উপরোক্ত কথা কেবল তখনই প্রযোজ্য হবে যখন অ্যাডভাইজিং ব্যাংক শুধু ডকুমেন্ট নেগোসিয়েট করবে। অবশ্য কখনও ইস্যুয়িং ব্যাংক এই ব্যাংক থেকে ইস্যুকৃত এলসির সত্যায়ন কামনা করে। যদি অ্যাডভাইজিং ব্যাংক তা গ্রহণ করে তখন এই ব্যাংককে البنك المعزز (Confirming Bank) কনফার্মিং ব্যাংক বলে। আর এমন হলে বেনিফিশিয়ারিকর্তৃক শিপিং ডকুমেন্ট তার নিকট উপস্থাপিত হলেই এলসিমূল্য সে পরিশোধ করে দেয়। তখন ডকুমেন্ট যাচাই-বাছাইকরণ, এলসিমূল্য পরিশোধ- এগুলোও তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

তখন এজেন্ট হিসেবে যে-কাজগুলো করে থাকে এর সাথে যুক্ত হবে ডকুমেন্ট পর্যালোচনা। আর ইস্যুয়িং ব্যাংকের কাফিল হিসেবে এলসিমূল্য প্রদানের দায়িত্বও যুক্ত হবে। ফলে অ্যাডভাইজিং ব্যাংকের দু'ধরনের কাজ হবে। ওকালাতের কাজ, কাফালাতের কাজ। যেমনটি ইস্যুয়িং ব্যাংকের হয়ে থাকে। তখন ইস্যুয়িং ব্যাংকের শরয়ীবিশ্লেষণে আমরা যা আলোচনা করেছি তা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। ফির ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রয়োগ হবে।

এলসির মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়ের শরয়ী বিধান

সপ্তম প্রশ্ন হলো, এলসিপ্রক্রিয়া অবলম্বন করে ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ হবে কি? এই প্রশ্নের উত্তর বিক্রেতা হিসেবে একরকম হবে, ক্রেতা হিসেবে আরেক রকম হবে।

বিক্রেতা হিসেবে এর বিধান যেমনটি আমরা এলসির শরয়ীবিশ্লেষণে আলোচনা করেছি যে, এলসিতে বিক্রেতার কাজ ছিল কেবল মূল্য পরিশোধের জন্য ক্রেতা হতে কাফিল দাবি করা। এর বেশি কিছু নয়। শিপিং ডকুমেন্ট হস্তগত করার পর তার নিকট সে পণ্য মূল্য দাবি করবে। ক্রেতা এবং ইস্যুয়িং ব্যাংকের মাঝে গৃহীত চুক্তির সাথে তার আদৌ সম্পর্ক নেই। অতএব মাল হস্তান্তরের পূর্বে ক্রেতার নিকট এলসি খোলার আবেদন করাতে শরয়ী কোনো সমস্যা নেই। কেননা, এখানে সারকথা হলো, বিক্রয়চুক্তির পূর্বেই কাফালা চাওয়া। আর এরূপ হলে তা الكفالة بالدرك বা ভবিষ্যৎদায়ের কাফালা, যা শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ। অনুরূপ ইস্যুয়িং ব্যাংক বা অ্যাডভাইজিং ব্যাংকের মাধ্যমে পণ্যমূল্য গ্রহণ করতে শরিয়তে কোনো বাধা নেই।

পক্ষান্তরে ক্রেতা হিসেবে এর বিধান হলো, যদি ক্রেতা জিরো মার্জিনে এলসি খোলে, অর্থাৎ এলসি খোলার সময় ব্যাংককে এলসিমূল্য পরিশোধ না করে, তা হলে সুদিব্যাংকের সাধারণ রীতি হলো তারা ডকুমেন্ট হস্তগত হলে বিক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করে দেয়। পরবর্তী সময়ে ক্রেতা থেকে তা উসুল করে নেয়। আর মূল্য পরিশোধ এবং ক্রেতা থেকে তা উসুল করা এই উভয়ের মাঝে সময়ের ব্যবধান থাকে, এর কারণে ব্যাংক ক্রেতা থেকে সুদ নিয়ে থাকে। উদাহরণত ডকুমেন্ট হস্তগত হলো এবং ব্যাংকের পক্ষ থেকে তা যাচাই-বাছাইও সম্পন্ন হলো। ব্যাংক তা শর্তানুযায়ী পেল এবং বিক্রেতার নিকট সরাসরি কিংবা অ্যাডভাইজিং ব্যাংকের মাধ্যমে জুমার দিন পণ্যমূল্য পাঠিয়ে দিল। কিন্তু ক্রেতা এই মূল্য সোমবার ব্যাংককে পরিশোধ করল। তা

হলে ব্যাংক তিনদিনের সুদ দাবি করবে। বলাবাহুল্য এ প্রক্রিয়ায় এলসিগ্রাহক নিষিদ্ধ সুদিচুক্তিতে জড়িয়ে যাবে। তাই এভাবে জিরো মার্জিনে এলসি খোলা জায়েয হবে না।

আর যদি ক্রেতা ফুল মার্জিনে এলসি খোলে অর্থাৎ এলসিতে উল্লেখিত পণ্যমূল্য ব্যাংককর্তৃক বিক্রেতাকে দেওয়ার পূর্বেই তাকে পরিশোধ করে দেয় তা হলে এখানে কোনো সুদিচুক্তির সংশ্লিষ্টতা নেই। তবে এলসি ফি ব্যাংককে পরিশোধের বিষয় আছে। এক্ষেত্রে এলসি ফির বিধান, যা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি, তা প্রযোজ্য হবে।

বাহ্যত তা ওইসব সেবার বিনিময়, যা ব্যাংকগ্রাহকের স্বার্থে আনজাম দিয়ে থাকে তা কেবল কাফালার বিনিময় নয়, যে কাফালা বা জামানত ব্যাংক বিক্রেতাকে দিয়ে থাকে। অতএব তা আশা করি ইনশাআল্লাহ বৈধ হবে।

বিল অব এক্সচেঞ্জের এনড্রোসমেন্ট তথা মালিকানা হস্তান্তরের বিধান

ইতোপূর্বে আমরা যা কিছু আলোচনা করেছি এগুলোর সম্পর্ক ছিল এলসিপ্রক্রিয়ার নগদবিক্রয়ের সাথে অর্থাৎ ডকুমেন্ট হস্তগত হওয়ার সাথে সাথে মূল্য পরিশোধ আবশ্যক। পক্ষান্তরে এই বিক্রি যদি বাকি হয় যেমনটি আমরা বৈদেশিক বাণিজ্যের বিশ্লেষণে উল্লেখ করেছি যে, ক্রেতা কখনও ডকুমেন্ট হস্তগত করার পর বিক্রেতার পক্ষ থেকে প্রেরিত বিলে প্রাপ্তি স্বীকারোক্তিস্বরূপ এবং বিলে উল্লেখিত মূল্য এলসিতে উল্লেখিত তারিখে পরিশোধ করা আবশ্যক- এই মর্মে স্বাক্ষর করে দেয়। ক্রেতাকর্তৃক স্বাক্ষরকৃত এই বিলকে আরবিভাষায় كمبيالة এবং ইংরেজিভাষায় Bill of Exchange বিল অব এক্সচেঞ্জ বলে। এরূপ হলে ব্যাংক তাৎক্ষণিক অর্থাৎ ডকুমেন্ট হস্তগত হওয়ার সাথে সাথে এলসিমূল্য পরিশোধ করে না। বিল অব এক্সচেঞ্জে স্বাক্ষর নেওয়ার পর শিপিং ডকুমেন্ট ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করে দেয়, যাতে করে তা দেখিয়ে ক্রেতা বন্দর থেকে পণ্য খালাস করতে পারে। তবে ব্যাংক এই নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, সে এলসিতে উল্লেখিত তারিখে বেনিফিশিয়ারির নিকট তা পরিশোধ করবে। এ নির্দিষ্ট সময় হওয়াকে আরবিভাষায় نضج الكمبيالة ইংরেজিভাষায় Maturity of the bill বলে। এই মেচুয়্যিরিটি হয়ে গেলে ব্যাংক আবশ্যকভাবে সে মূল্য পরিশোধ করে এবং পরবর্তী সময়ে তা ক্রেতা হতে উসুল করে নেয়। এই প্রকৃতির এলসিকে الاعتماد المؤجل usance L/C এলসি বলে।

এই প্রক্রিয়ায় কখনও এমনও হয় যে, বিক্রেতা বিল অব এক্সচেঞ্জের মেয়াদপূর্তির অপেক্ষা করে না। বরং সে তাৎক্ষণিক পণ্যমূল্য পেতে চায়, যাতে করে সে অর্থ অন্যান্য কাজে লাগাতে পারে। তখন সে এ বিল অব এক্সচেঞ্জ কোনো ব্যাংকের নিকট পেশ করে, তা ইস্যুয়িং ব্যাংক হোক বা অ্যাডভাইজিং ব্যাংক বা অন্যকোনো ব্যাংক। আর তখন সে বিল অব এক্সচেঞ্জের অপর পৃষ্ঠে মালিকানা হস্তান্তর নিমিত্তে স্বাক্ষর করে দেয়। যাতে করে ব্যাংক মেয়াদপূর্তির সময় ইস্যুয়িং ব্যাংক বা ক্রেতা থেকে (যদি এলসিবিহীন চুক্তি হয়ে থাকে) বিলে উল্লেখিত মূল্য উসুল করে নিতে পারে।

ক্রেতাকর্তৃক এই স্বাক্ষর, যা মালিকানা হস্তান্তরের নিমিত্তে হয়ে থাকে, একে تظهير Endrosement এনড্রোসমেন্ট (পৃষ্ঠাঙ্কন) বলে। এমন এনড্রোসমেন্টকৃত বিল অব এক্সচেঞ্জ বুঝে নেওয়ার পর ব্যাংক বিল অব এক্সচেঞ্জের মূল্য কিছুটা কমিয়ে বিক্রেতাকে পরিশোধ করে দেয়।

উদাহরণস্বরূপ, যদি ১শ ডলারের বিল হয় তা হলে ৯৯ ডলার প্রদান করবে। এ বিল বাট্টাকরণকে সাধারণ পরিভাষায় حسم الكمبيالة বা خصم الكمبيالة বলে। আর ইংরেজিভাষায় একে Discounting of the Bill ডিসকাউন্টিং অব দ্যা বিল বলে।

এ বিল অব এক্সচেঞ্জ দুই প্রকার। যথা :

এক.

যাতে একথার উল্লেখ থাকবে যে, মালিকানা হস্তান্তরের সাথে সাথে মালিকের দায়ের পরিসমাপ্তি ঘটবে। অর্থাৎ যদি ঋণদাতা ব্যাংক বিল অব এক্সচেঞ্জে উল্লেখিত মূল্য উসুল করতে কোনোভাবে ব্যর্থ হয় তখন তার এ অধিকার থাকবে না যে, সে এন্ড্রোসমেন্টকারী তথা মালিকের নিকট ফিরে যাবে এবং তার থেকে বিলের মূল্য উসুল করবে।

এধরনের এন্ড্রোসমেন্ট হলে এন্ড্রোসমেন্টে بدون رجوع Without Recourse তথা 'পুনরায় তার থেকে উসুলের সুযোগ থাকবে না' একথা লেখা থাকবে।

বিল অব এক্সচেঞ্জের এমন মালিকানাহস্তান্তর মূলত কমমূল্যে ঋণ বিক্রি بيع الدين بمبلغ أقل من الدين[৩২] আর ঋণ বিক্রি সমান মূল্যে হলেও জমহুর

---

৩২. دين কাকে বলে?

আলেমের অভিমত অনুযায়ী নাজায়েয। যেমনটি আমরা ঋণ বিক্রি অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। তা হলে কম মূল্যে হলে তো তা আরও কঠিন নাজায়েয হবে। কেননা, কম মূল্যে হলে এই চুক্তিটি সুদিকার্যক্রমে পরিণত হয়, যা শরিয়তের দৃষ্টিতে স্পষ্ট হারাম।

দুই.

দ্বিতীয় প্রকার হলো, যাতে বিল হোল্ডার প্রয়োজনে এন্ড্রোসমেন্টকারীর তথা মালিকের নিকট ফিরে যেতে পারে। অর্থাৎ যদি সে মূল ব্যক্তি থেকে উক্ত অর্থ উসুল করতে ব্যর্থ হয় তা হলে সে এন্ড্রোসমেন্টকারী থেকে বিলের মূল্য উসুল করে নেবে। এমন হলে তা بيع الدين ঋণের বিক্রি হবে না। তা ফিকহে হানাফীর দৃষ্টিকোণ থেকে حوالة চুক্তি হবে।[৩৩]

শরিয়তের দৃষ্টিতে دين শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। যেকোনো ধরনের আবশ্যক পাওনাকে دين বলে; তা ঋণ নেওয়ার কারণে আবশ্যক হোক অথবা কোনো জিনিস ক্রয় করার কারণে। মোটকথা কোনো মাল যার দায় কারো উপর চেপে গেছে এবং সেটা তার পরিশোধ করতে হবে, তাকেই دين বলে। পক্ষান্তরে যদি, কেউ কারো থেকে কোনো সমতাযোগ্য (مثلي) বস্তু ধার নেয়, তাকে قرض বলে। বিল অফ এক্সচেঞ্জের ডিসকাউন্টিংকে بيع الدين বলা হলে তা আরো কঠিন নিষিদ্ধ বিষয়ে পরিণত হয়। কেননা সমতা বজায় না রেখে বেশকম করে دين বিক্রি করা সকলের নিকটই নিষিদ্ধ। আর সমতা বজায় রেখে বিক্রি করা ফিকহে হানাফি, ফিকহে হামবলি ও ফিকহে শাফেয়ি অনুযায়ী নিষিদ্ধ। বিস্তারিত দেখুন : 'বুহুস ফি কাযায়া ফিকহিয়্যা মুআসারা', ২/২৯।

৩৩. حواله এর পরিচয়

حواله হাওয়ালা শরিয়তে ইসলামির এক ফিকহি পরিভাষা। حواله শব্দের অর্থ স্থানান্তর করা। শরিয়তের পরিভাষায় حواله বলা হয় ঋণের দায়কে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির দায় থেকে অন্য ব্যক্তির যিম্মায় স্থানান্তরিত করা। মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে محيل মুহিল বলে। ঋণের দায়বহনকারীকে محتال عليه মুহতাল আলাইহি বলে। আর পাওনাদারকে محتال له মুহতাল লাহু বলে। এই তিনজনের সম্মতিক্রমে হাওয়ালা চুক্তি বৈধ।

তবে হাওয়ালায় উভয় ঋণ সমান সমান হওয়া আবশ্যক। বিল অফ এক্সচেঞ্জের ডিসকাউন্টিং মূলত ঋণ প্রদান (إقراض) এবং হাওয়ালার সমষ্টি। বিল অফ এক্সচেঞ্জ গ্রহণকারী প্রথমে বাকিতে অধিক প্রদানের শর্তে বিল এক্সচেঞ্জের স্বত্বাধিকারীকে ঋণ দিয়ে থাকে। তারপর এই ঋণের পরিবর্তে বিল অফ এক্সচেঞ্জ নিয়ে নেয়। যেহেতু উভয় ঋণ সমান নয়। সময়ের ব্যবধানজনিত কারণে একদিকের পরিমাণ বেশি, তাই এখানে ربا النسيئة এর স্পষ্ট উপস্থিতি রয়েছে।

হানাফী ফকিহগণ حوالة এর ক্ষেত্রে অর্থ উত্তোলনে ব্যর্থ হলে حوالة-গ্রহীতাকে حوالة-কারীর নিকট ফিরে গিয়ে তার থেকে উসুল করার সুযোগের কথা উল্লেখ করেছেন।

তবে কথা হলো, এভাবে যদিও حوالة জায়েয, কিন্তু উল্লেখিত প্রক্রিয়ায় মালিকানা হস্তান্তর বিলে উল্লেখিত অর্থের পরিমাণ থেকে কম মূল্যে হয়ে থাকে। ফলে এতে সুদের সংমিশ্রণ ঘটে যায়। তাই ই প্রক্রিয়ায়ও বিল অব এক্সচেঞ্জের ডিসকাউন্টিং নাজায়েয।

ব্যাংকিং পদ্ধতিতে নাজায়েয ব্যবসাবাণিজ্যের বিকল্প পদ্ধতি:

নবম প্রশ্ন হলো, বর্তমানে প্রচলিত এই সুদভিত্তিক কার্যক্রমের সংশোধনের কোনো পদ্ধতি আছে কি না, যাতে করে তা শরিয়তের বিধানের অনুকূলে হয়ে শরিয়তসম্মত হয়ে যায়?

এই প্রশ্নের উত্তর হলো, প্রচলিত কার্যক্রমে মূলত শরিয়তনিষিদ্ধ বিষয় তিনটি। যথা :

এক. জামানতের ফি গ্রহণ।

দুই. জিরো মার্জিন এলসিতে সুদিকার্যক্রম।

তিন. বিল অব এক্সচেঞ্জের ডিসকাউন্টিং।

জামানতের ফি নেওয়ার বিষয়ে (আল্লাহ তায়ালার শোকর) আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এই বিষয়ে স্পষ্ট কথা হলো, এলসি ওপেনিং শুধু কাফালা চুক্তিকরণ নয়। বরং এর সাথে অন্যান্য ব্যাংকিংসেবাও যুক্ত আছে, যেগুলো ব্যাংক গ্রাহকদের জন্য আনজাম দিয়ে থাকে। আর সেগুলোর বিনিময় নিতে শরিয়তে বাধা নেই। আর এই 'ফি'কে এলসিতে উল্লেখিত মূল্যের সাথে যুক্ত করে দেওয়ার মাসআলাটিও আলোচনা করেছি। তার পুনরোল্লেখ অনাবশ্যক।

জিরো মার্জিন এলসিতে সুদিপ্রক্রিয়ার বিকল্প ব্যবস্থা

জিরো মার্জিন এলসিতে ব্যাংককর্তৃক অতিরিক্ত অর্থের দাবি তো স্পষ্ট সুদ হওয়ার কারণে নাজায়েয। এর শরিয়তসম্মত আদর্শিক বিকল্প হলো, ব্যাংক গ্রাহকদের সাথে পণ্য আমদানির বেলায় মুদারাবা কিংবা শিরকাহ চুক্তি করবে।[৩৪]

---

৩৪. বিনিয়োগের আদর্শিক পদ্ধতি

মূলত বিনিয়োগের আদর্শিক পদ্ধতি মুশারাকা ও মুদারাবা, শরিয়তের দৃষ্টিতে যৌথ ব্যবসার বিকল্প পদ্ধতি এই দুটি পন্থাই। যৌথকারবারে যদি উভয় পক্ষ/সকল পক্ষ পুঁজি বিনিয়োগ করে, তা হলে একে শিরকাত ও মুশারাকা বলে আর যদি একপক্ষ অর্থ সরবরাহ করে অন্যপক্ষ শ্রম দিয়ে ব্যবসাপরিচালনা করে, তা হলে একে মুদারাবা বলে। নিম্নে মুশারাকা ও মুদারাবা পরিচয় ও জরুরি দিকগুলো তুলে ধরা হলো।

মুশারাকা

১. মুশারাকা শব্দের আভিধানিক অর্থ অংশীদার হওয়া। এখানে মুশারাকা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে 'শিরকাতুল আকদ' তথা চুক্তিভিত্তিক অংশীদারিত্ব। ব্যবসাপরিচালনার জন্য একাধিক ব্যক্তির অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে শরিকানা কারবারের চুক্তি করা হলে তাকে শিরকাতুল আকদ বলে। এ যৌথকারবারে সকল অংশীদার লাভ-লোকসানে শরিক থাকে। 'শিরকাতুল আকদ'-এর অন্যতম প্রকার হলো 'শিরকাতুল ইনান'। যে শরিকানা কারবারে মূলধন, ব্যবস্থাপনা ও লাভে সকল শরিকের সমান অংশীদারিত্ব বাধ্যতামূলক নয়, একজনের চেয়ে অন্যের মূলধন বেশি বা কম হতে পারে; লাভও সমানভাবে বণ্টিত হওয়া বাধ্যতামূলক নয়, বরং চুক্তিতে লাভের অনুপাত যেভাবে উল্লেখ থাকবে সেভাবেই মুনাফা বণ্টিত হবে, তবে লোকসান সকল অংশীদারকে মূলধনের অনুপাতে বহন করতে হবে, এমন শরিকানা কারবারকে শরিয়তের পরিভাষায় শিরকাতুল ইনান বলে। এ শরিকানা কারবারে ব্যবস্থাপনার কাজে অংশগ্রহণের অধিকার সকল অংশীদারের থাকবে। তবে একজন বা কিছু সংখ্যক অংশীদারকে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেওয়া বৈধ।

২. মুশারাকাচুক্তি বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো কারবার শুরু করার পূর্বেই লভ্যাংশ বণ্টনের হার নির্ধারণ করে নেওয়া, অন্যথায় অংশীদারি কারবারের চুক্তি বৈধ হবে না। এক্ষেত্রে যেকোনো হার নির্ধারণ করা যাবে। তবে কেউ কাজ না করার শর্ত করলে তার মুনাফা বিনিয়োগকৃত পুঁজির হার থেকে বেশি হতে পারবে না।

৩. প্রত্যেক অংশীদারের মুনাফা প্রকৃত মুনাফার ভিত্তিতে হতে হবে। প্রদত্ত পুঁজির ভিত্তিতে হতে পারবে না। অনুরূপ কোনো অংশীদারের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ বা বিনিয়োগকৃত পুঁজির বিনিময়ে নির্ধারিত কোনো অংক ধার্য করা যাবে না।

৪. মুশারাকা কারবারে কারো পুঁজি অক্ষত থাকার শর্ত বৈধ নয়। এমন শর্ত মুশারাকা চুক্তির শরয়িনীতির পরিপন্থী।

৫. ব্যবসায় লোকসান হলে যে অংশীদার পরিচালনার দায়িত্বে আছেন তার উপর সব ক্ষতির বোঝা চাপানো বৈধ নয়, তবে ক্ষতি তার ত্রুটির কারণে হলে এবং তা প্রমাণিত হলে যে পরিমাণ ক্ষতি তার ত্রুটির কারণে হয়েছে সে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ তার থেকে উসুল করা যাবে।

মুদারাবা

শরিয়তের পরিভাষায় মুদারাবা এমন অংশীদারি কারবারকে বলে, যে কারবারে এক শরিক অপর শরিককে মূলধন সরবরাহ করে, আর অপর শরিক মেধা ও শ্রম ব্যয় করে

...ক মূলধন দিয়ে ব্যবসাপরিচালনা করে। মূলধন সরবরাহকারী পক্ষকে রাব্বুল মাল/সাহিবুল মাল বলে, আর ব্যবসা পরিচালনাকারীকে মুদারিব বলে।

১. মুদারাবা কারবারে রাব্বুল মাল তার সরবরাহকৃত পুঁজি অক্ষত থাকার বা ক্ষতি না হওয়ার শর্ত আরোপ করতে পারবে না এবং মুদারিবের নিকট হতে এ ধরনের কোনো গ্যারান্টি নিতে পারবে না যে, মুদারিব সর্বাবস্থায় মূলধন ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। ব্যবসায় লোকসান হলে তার মূলধন খোয়া যাবে। তবে মুদারিবের অবহেলা, সীমালঙ্ঘন ইত্যাদির কারণে লোকসান হলে তা মুদারিব বহন করতে বাধ্য থাকবে।

২. মুদারাবা চুক্তি বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো কারবার শুরু করার পূর্বেই লভ্যাংশ বণ্টনের হার নির্ধারণ করে নেওয়া, অর্থাৎ শুরুতেই ফায়সালা করতে হবে যে, মুদারিব লাভের কত পার্সেন্ট/অংশ পাবে আর রাব্বুল মাল কত অংশ। লভ্যাংশ বণ্টনের নির্দিষ্ট কোনো অনুপাত শরিয়ত নির্ধারণ করেনি। উভয়পক্ষের স্বাধীন মতের উপর শরিয়ত ছেড়ে দিয়েছে। সমহারেও হতে পারে, বেশকম করেও হতে পারে। যেমন : লভ্যাংশের ৩০% রাব্বুল মালের, ৭০% মুদারিবের। তবে কোনোপক্ষই নিজের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ নির্ধারণ করতে পারবে না। যেমন : রাব্বুল মালের জন্য লভ্যাংশের ১০ হাজার টাকা, আর অবশিষ্ট লভ্যাংশ মুদারিবের। এভাবে নির্ধারণ নাজায়েয। অনুরূপ সরবরাহকৃত মূলধনের আনুপাতিক হারও নির্ধারণ করা যাবে না। যেমন : এক লক্ষ টাকার মুদারাবা ব্যবসা। এতে মূলধনের ২৫% অর্থাৎ ২৫০০০ টাকা (বাৎসরিক) রাব্বুল মালের জন্য নির্ধারণ করা হলো, এভাবে করা হলে মুদারাবা শুদ্ধই হবে না। মুদারাবাব্যবসায় প্রকৃত লভ্যাংশের হার নির্ধারণ করতে হবে, যদি ব্যবসায় লাভ হয় তা হলে লভ্যাংশের নির্দিষ্ট হার সে পাবে, তা যে পরিমাণই হোক, আর লাভ না হলে কিছুই পাবে না।

৩. মুদারিব প্রচলিত রীতিমোতাবেক ব্যবসার সকল কাজ সম্পাদন করবেন, এটা মুদারিব হিসাবে তার দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের কারণে সে মুনাফার ধার্যকৃত হার পাবে, মুনাফার এ ধার্যকৃত হার ব্যতীত মুদারিব স্বীয় কাজের বিনিময়ে বেতন ভাতা বা অন্যকোনো বিনিময় দাবি করতে পারবে না। তবে নিজ শহর ব্যতীত অন্যকোনো শহরে ব্যবসায়ী সফরে বের হলে সেখানে থাকা-খাওয়ার ব্যয় (প্রচলিত রীতি অনুযায়ী) মুদারাবা ফান্ড থেকে নিতে পারবে।

৪. মূলধন অক্ষত থাকা ব্যতীত মুদারাবার লাভ ধর্তব্য হবে না। মুদারাবার কোনো কার্যক্রমে লোকসান হলে অন্যান্য কার্যক্রমে প্রাপ্ত লাভ দ্বারা তা পূরণ করা হবে। পূর্বের ক্ষতিকে পরবর্তী লাভের সাথেও সমন্বয় করা হবে, চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে প্রকৃত লাভ-ক্ষতি নির্ণয় হবে।

৫. মুদারাবা ব্যবসায় লোকসান হলে প্রথমে তা লাভ দ্বারা পূরণ করা হবে, ক্ষতি নির্বাহের পর যদি লভ্যাংশ থাকে তা হলে তা পূর্বনির্ধারিত আনুপাতিক হারে বণ্টিত হবে। আর যদি অবশিষ্ট না থাকে, তা হলে মুদারিব কিছুই পাবে না। যদি লভ্যাংশ দ্বারা ক্ষতিনির্বাহ

আমদানিকারকগণ সাধারণত পণ্য আমদানি তখনই করে থাকেন যখন তার নিকট সেই পণ্যের ক্রয়চাহিদা থাকে। অতএব যদি আংশিক মার্জিনে এলসি খোলা উদ্দেশ্য হয় তা হলে ব্যাংক গ্রাহকের সাথে শিরকাহ্ চুক্তি করবে। মূলধনে আংশিক মার্জিন গ্রাহকের অংশ হবে আর বাকিটা ব্যাংকের অংশ হবে। পণ্যপ্রাপ্তির পর বাজারে বিক্রি করলে যে মুনাফা হবে তা বণ্টনের আনুপাতিক হার পূর্বেই নির্ধারণ করে নিতে হবে। এমন হলে এলসি-ফি শিরকাতের ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে।

আর যদি কারও জিরো মার্জিনে এলসি খোলা উদ্দেশ্য হয় তা হলে উভয়ে মুদারাবা চুক্তি করবে। ব্যাংক রব্বুল মাল হবে। ডকুমেন্টপ্রাপ্তির পর সে অর্থ প্রদান করবে আর গ্রাহক মুদারিব হবে। কেননা, সেই রপ্তানিকারকের সাথে ক্রয়চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে এবং সেই বন্দর থেকে পণ্য খালাস করবে। তারপর তা বাজারে বিক্রি করবে। এতে যে মুনাফা অর্জিত হবে, তা মুদারাবাচুক্তিতে নির্ধারিত হারে উভয়ের মাঝে বণ্টিত হবে।

বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকগুলো জিরো মার্জিন এলসি মুরাবাহাভিত্তিক খুলে থাকে।[৩৫] এই মুরাবাহার পদ্ধতি হলো আমদানিপ্রত্যাশী গ্রাহক যখন এলসি

সম্ভব না হয়, তা হলে মূলধন থেকে নির্বাহ করা হবে। এক্ষেত্রে মুদারিবকে কিছুই দিতে হবে না, তার কেবল শ্রম নিষ্ফল হবে; তবে ব্যবসায়ের এই ক্ষতি মুদারিবের কোনোরূপ অবহেলা বা সীমালঙ্ঘনের কারণে হলে সে ক্ষতি মুদারিবকেই বহন করতে হবে।

৩৫. (ক) مرابحة মুরাবাহার পরিচয়

ক্রয়মূল্যের উপর নির্ধারিত লাভ যোগ করে কোনো পণ্য বিক্রি করাকে শরিয়তের দৃষ্টিতে মুরাবাহা বলে। মুরাবাহা (مرابحة) শব্দটি মূলত 'রিবহুন' ربح শব্দমূল হতে উদ্ভূত। 'রিবহুন'র আভিধানিক অর্থ হলো লাভ (Profit) পারিভাষিক অর্থে মুরাবাহার সংজ্ঞা হল :

نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح

প্রথম মূল্যের (ক্রয় মূল্যের) সাথে লাভ যুক্ত করে প্রথম চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত মালিকানা হস্তান্তর করাকে মুরাবাহা বলে। (আলহিদায়া খণ্ড ৩/৭০)

মুরাবাহা পদ্ধতিতে অর্থায়নের মৌলিক বৈশিষ্ট্য

১. মুরাবাহা সুদভিত্তিক প্রদেয় ঋণ নয়। বরং মুরাবাহা হচ্ছে, বাকিতে মূল্য পরিশোধের ভিত্তিতে কোনো পণ্যের বিক্রি, যে বিক্রিমূল্যে পণ্য সংগ্রহ ব্যয় ব্যতীত নির্ধারিত মুনাফাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২. মুরাবাহা যেহেতু ঋণ প্রদান করা নয়, বরং ক্রয়-বিক্রয়ের এক বিশেষ প্রকার। তাই এতে ওইসব শর্ত পরিপূর্ণভাবে থাকা অপরিহার্য, যা শরিয়তের দৃষ্টিতে বিশুদ্ধ ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য নির্ধারিত।

৩. মুরাবাহা বেচাকেনার এক বিশেষ প্রকার। যদি বিক্রেতা বিক্রীত পণ্যের ব্যয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেয় এবং তার উপর কিছু মুনাফা সংযোজন করে অন্যের নিকট বিক্রি করে, তাকে মুরাবাহা বলে।

৪. মুরাবাহায় মুনাফা (Mark Up) নির্ধারণ পারস্পরিক সন্তুষ্টিতে দু'পদ্ধতির হতে পারে। নির্দিষ্ট পরিমাণের অংক নির্ধারণ করে নেবে (যেমন : ব্যয়ের উপর এত টাকা অতিরিক্ত) অথবা ব্যয়ের উপর বিশেষ আনুপাতিক হার নির্ধারণ করে নেবে (অর্থাৎ ব্যয়ের উপর এত পার্সেন্ট অতিরিক্ত)।

৫. যে পণ্য বিক্রি করা হবে তা সংগ্রহ করতে বিক্রেতার যে পরিমাণ টাকা ব্যয় হয়েছে, যেমন : মাল বহনের ভাড়া, কাস্টম ডিউটি ইত্যাদি ব্যয়ে সংযোজন হবে এবং মুনাফা (Mark Up) সামগ্রিক ব্যয়ের উপর ধার্য করা হবে। কিন্তু ব্যবসাপরিচালনার খরচ যা নির্দিষ্ট পণ্য সংগ্রহের সাথে সম্পৃক্ত নয়, যেমন : কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, বিল্ডিং ভাড়া ইত্যাদি, এসব ব্যয়কে একক লেনদেনের ব্যয়ে সংযোজন করা যাবে না। তবে ব্যয়ের উপর যে মুনাফা নির্ধারণ করা হবে তাতে সব ধরনের খরচের প্রতি লক্ষ্য রাখা যাবে।

৬. মুরাবাহা কেবল ওই ক্ষেত্রে শুদ্ধ হবে, যেখানে পণ্য সংগ্রহের পূর্ণ ব্যয় নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। যদি পণ্যের পূর্ণ ব্যয় নির্ধারণ করা না যায়, তা হলে সে পণ্য মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রি করা যাবে না।

৭. কোনো পণ্য গ্রাহকের নিকট বিক্রির পূর্বে তাতে বিনিয়োগকারীর মালিকানাপ্রতিষ্ঠা হওয়া অপরিহার্য।

৮. বিক্রির পূর্বে সে পণ্য বিনিয়োগকারীর প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ দখলে (কবজায়) থাকতে হবে। অর্থাৎ সে পণ্য কিছুক্ষণের জন্য হলেও তার দায়ভারে থাকতে হবে। তখন পণ্যের কোনো ক্ষতি হলে তা বিনিয়োগকারীর ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত হবে।

৬. আমদানিকারক যদি রপ্তানিকারকের সাথে ক্রয়চুক্তি সম্পন্ন করে ফেলে তা হলে এ পণ্যে ব্যাংকের সাথে কোনোভাবেই মুরাবাহা চলবে না। এক্ষেত্রে কৃত চুক্তিটি সম্পূর্ণরূপে বাতিল করতে হবে। কৃত্রিম বাতিলও গ্রহণযোগ্য নয়। পূর্বকৃত চুক্তিটি পূর্ণ বাতিল করে ব্যাংককে নতুনভাবে রপ্তানিকারকের সাথে ক্রয়চুক্তি সম্পন্ন করতে হবে। তারপর বিএল ও অন্যান্য ডকুমেন্টস হস্তগত হলে গ্রাহকের সাথে মুরাবাহা করতে পারবে, এর পূর্বে নয়। তবে গ্রাহক রপ্তানিকারকের সাথে চুক্তিপূর্ব কাজ যেমন : দর কষাকষি, যাচাই-বাছাই ইত্যাদি করতে পারবে।

المعايير الشرعية (শরয়ি স্টান্ডার্ড) এ উল্লেখ আছে,

١/٢/٢- اذا صدر من العميل جواب بالقبول على ايجاب البائع الموجه اليه خاصة او الخالي من أي توجيه ففي هذه الحالة لايجوز للمؤسسة اجراء عملية المرابحة للآمر بالشراء

٢/٢/٢ - يجب الغاء اي ارتباط عقدي سابق بين العميل الامر بالشراء والبائع الأصلي ان وجد ويشترط ان تكون هذه الاقالة من الطرفين حقيقة وليست صورية ولايجوز تحويل العقد المبرم بين العميل والمصدر الى الموسسة

১/১/২ রপ্তানিকারকের পক্ষ থেকে গ্রাহকের নামে ইস্যুকৃত বিক্রি প্রস্তাব অথবা নামবিহীন বিক্রি প্রস্তাবে যদি গ্রাহকের পক্ষ থেকে উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ সংক্রান্ত সম্মতি জ্ঞাপক কোনো কিছু প্রকাশ পায়, তা হলে এক্ষেত্রে ব্যাংকের জন্য উক্ত পণ্যে গ্রাহকের সাথে মুরাবাহার চুক্তি করা নাজায়েয।

১/২/২ যদি গ্রাহক ও রপ্তানিকারকের মাঝে ক্রয়চুক্তি জাতীয় কিছু হয়ে থাকে তা হলে এজাতীয় সব সম্পর্ক বাতিল করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে বাস্তবিক ইকালা চুক্তি (চুক্তি রহিতকরণ) আবশ্যক কৃত্রিম ইকালা গ্রহণযোগ্য নয়। রপ্তানিকারক ও গ্রাহকের মাঝে সম্পন্নকৃত চুক্তি ব্যাংকের সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়ার কোন অবকাশ নেই তা নাজায়েয।

٤/١/٢ - يجوز للعميل ان يحصل على عروض باسعار السلعة سواء كانت موجهة باسمه الخاص أو خالية من التوجيه وعند ذلك تعتبر ارشادية وليس لها صفة الايجاب ويفضل ان تكون العروض باسم المؤسسة لتعتبر ايجابا من البائع يظل قائما إلى انتهاء المدة المحدودة فيه فاذا صدر جواب بالقبول من المؤسسة انعقد البيع تلقائيا بينها وبين البائع

৪/১/২ গ্রাহকের জন্য পণ্যের দরপত্র সংগ্রহ বৈধ, নামবিহীন হোক অথবা গ্রাহকের নামে ইস্যু হোক। বিক্রেতার পক্ষ থেকে এই দরপত্র ইজাব তথা বিক্রয়প্রস্তাব হিসাবে গণ্য হবে না। বরং তা প্রাথমিক প্রস্তাবনা সাব্যস্ত হবে। অবশ্য এ দরপত্র সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাংকের নামে হওয়াই ভালো; এতে করে তা বিক্রেতার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত ইজাব তথা বিক্রিপ্রস্তাব সাব্যস্ত করা যাবে। আর এমন হলে ব্যাংকের পক্ষ থেকে কবুল অর্থাৎ, উক্ত প্রস্তাবের সম্মতি জ্ঞাপক গ্রহণ পাওয়া গেলেই ব্যাংক এবং বিক্রেতার মাঝে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিক্রিচুক্তি সংঘটিত হয়ে যাবে।

অন্যত্র উল্লেখ আছে,

في حالة رغبة العميل ان يشتري من المؤسسة بضاعة مستوردة عن طريق المرابحة باعتماد مستند يجب ان يراعى ما يأتي

١/٥/٣ - أن لايسبق فتح الاعتماد ابرام عقد البيع بين الآمر والمستفيد (البائع) سواء قبض الآمر البضاعة محل العقد أم لم يقبضها -

٢/٥/٣ - أن تكون المؤسسة من المشتري من المصدر ثم يبيع إلى العميل مرابحة وفقا للأحكام المبينة -

গ্রাহক এলসির মাধ্যমে ব্যাংক থেকে আমদানিকৃত পণ্য মুরাবাহা পদ্ধতিতে ক্রয় করতে চাইলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখা আবশ্যক।

১/৫/৩ এলসি খোলার পূর্বে গ্রাহক ও রপ্তানিকারক (বিক্রেতা) এর মাঝে বিক্রি চুক্তি চূড়ান্ত হতে পারবে না, গ্রাহক উক্ত পণ্যের দখল বুঝে নিক বা না নিক।

২/৫/৩ প্রকৃত অর্থেই ব্যাংক রপ্তানিকারক থেকে ক্রয় করতে হবে। তারপর মুরাবাহা অধ্যায়ে বর্ণিত নীতিমালার আলোকে গ্রাহকের নিকট তা মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রি করতে হবে।

(খ) মুরাবাহা পদ্ধতিতে আমদানি-বাণিজ্য

মধ্যপ্রাচ্যের অনেক ইসলামি ব্যাংক সরাসরি নিজ নামে এলসি খুলে সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে মাল আমদানি করে মুরাবাহাপদ্ধতিতে গ্রাহকের নিকট তা বিক্রি করে থাকে। আমাদের দেশের ইসলামি ব্যাংকগুলো গ্রাহকের নামেই এলসি খুলে থাকে। মাল আমদানি করার জন্য লাইসেন্স, IRC ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আমাদের দেশে গ্রাহকের নামেই থাকে। ব্যাংকের জন্য সরাসরি আমদানি করার প্রয়োজনীয় সহায়ক আইনও আমাদের দেশে নেই। ফলে ব্যাংকের নামে সরাসরি এলসি খোলাও যায় না। এই অবস্থায় ব্যাংকের নামে সরাসরি এলসি খুলে আমদানির পক্ষে সহায়ক আইন না হওয়া পর্যন্ত কেউ কেউ ওয়াকালাপদ্ধতি অনুসরণ করে এলসি খোলার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। আর সেটি হচ্ছে ইসলামি ব্যাংক গ্রাহককে রপ্তানিকারক হতে মাল ক্রয় ও আমদানির ওয়াকিল (প্রতিনিধি) বানাবে। এজন্য যথারীতি গ্রাহক ও ইসলামি ব্যাংকের মাঝে ওয়াকালাচুক্তি হবে। এ ওয়াকালাচুক্তিতে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে গ্রাহক ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে নিজ নামেও ক্রয়চুক্তি এবং এলসি খুলতে পারবে। কিন্তু এই এলসি ও ক্রয়চুক্তির দায়িত্বসমূহ ব্যাংকের উপরই বর্তাবে। মাল বা তার ডকুমেন্টস হস্তগত হলে তারপর ব্যাংক গ্রাহকের নিকট মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রি করবে এবং মালের দখল গ্রাহককে বুঝিয়ে দিবে। মুরাবাহাচুক্তির পর গ্রাহক এ মালের দখল বুঝে না পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই মালের সকল প্রকার ঝুঁকি ব্যাংককে বহন করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে এলসি ফি ইত্যাদি ব্যাংককে বহন করতে হবে। অবশ্য এসব কারণে মুরাবাহাতে লাভের হার বাড়িয়ে ধরতে পারবে।

المعايير الشرعية তে উল্লেখ আছে,

٣/١/٣- الأصل أن تشتري المؤسسة السلعة بنفسها مباشرة من البائع ويجوز لها تنفيذ ذلك عن طريق وكيل غير الأمر بالشراء ولاتلجاء لتوكيل العميل (الامر بالشراء) إلا عند الحاجة الملحة ولايتولى الوكيل البيع لنفسه بل تبيعه المؤسسة بعد تملكها العين -

٥/١/٣- يجب الفصل بين الضمانين ضمان المؤسسة وضمان العميل الوكيل عن المؤسسة في شراء السلعة لصالحها وذلك بتخلل مدة بين تنفيذ الوكالة وابرام عقد

المرابحة للآمر بالشراء من خلال الاشعار من العميل بتنفيذ الوكالة والشراء ثم الاشعار من المؤسسة بالبيع -

٦/١/٣ - الأصل أن تكون الوثائق والعقود والمستندات الصادرة عند ابرام عقد شراء السلعة باسم المؤسسة وليس العميل حتى لو كان هذا الأخير وكيلا عنها -

٧/١/٣ - يجوز أن يتفق الطرفان عند توكيل المؤسسة لغيرها في شراء السلعة أن تكون الوكالة غير معلنة فيتصرف الوكيل كالأصيل أمام الأطراف الأخرى ويتولى الشراء مباشرة باسمه ولكن لصالح المؤسسة (الموكل) غير ان افصاح الوكيل بصفته الحقيقة أولى -

৩/১/৩ বিক্রেতা হতে ব্যাংক সরাসরি নিজে মাল ক্রয় করবে। এটিই মূল নিয়ম। তবে বিনিয়োগ গ্রাহক ব্যতীত অন্যকাউকে উকিল (প্রতিনিধি) বানিয়ে তার মাধ্যমেও ব্যাংক মাল ক্রয় করতে পারবে। কিন্তু অনন্যোপায় হওয়া ছাড়া বিনিয়োগ গ্রাহককে উকিল বানানো ঠিক হবে না। এক্ষেত্রে উকিল নিজে নিজের নিকট উক্ত পণ্য বিক্রি করতে পারবে না, বরং (উকিল থেকে) পণ্যের মালিকানা বুঝে নেয়ার পর ব্যাংকই বিনিয়োগ গ্রাহকের (উকিল) নিকট তা বিক্রি করবে।

৫/১/৩ উভয় যামানতের (পণ্য ঝুঁকি) সীমারেখা স্পষ্ট হওয়া জরুরি। মাল কখন ব্যাংকের যামানতে (ঝুঁকি) থাকবে। আর কখন তা বিনিয়োগ গ্রাহকের তথা ব্যাংকের জন্য ক্রয়কারী প্রতিনিধির ঝুঁকিতে প্রবেশ করবে উভয় বিষয় স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। তা এভাবে হবে যে, ওয়াকালাচুক্তি বাস্তবায়ন আর গ্রাহকের সাথে মুরাবাহাচুক্তির বাস্তবায়ন এই দুইয়ের মাঝে সময়ের ব্যবধান থাকতে হবে। গ্রাহক প্রথমে উকিল হিসাবে কাজ সম্পন্ন করার পর ব্যাংকের নিকট লিখিত অবগতিপত্র পাঠাবে এবং পাশাপাশি ক্রয়প্রস্তাবও এর সাথে সংযুক্ত করে দেবে। ব্যাংক তা হস্তগত করে বিক্রির সম্মতিসূচক পত্র পাঠাবে।

৬/১/৩ মালের ক্রয় চুক্তি সম্পাদনের সময় প্রমাণপত্র, চুক্তিনামা, ডকুমেন্ট ইত্যাদি ব্যাংকের নামে হবে। এটিই মূল নিয়ম। এমনকি বিনিয়োগ গ্রাহক উকিল হলেও তার নামে হবে না।

৭/১/৩ ব্যাংক যখন মাল ক্রয়ের জন্য অন্য কাউকে উকিল বানাবে, তখন উভয় পক্ষের সম্মতিতে ওয়াকালাচুক্তির বিষয়টি গোপনও রাখতে পারবে। তখন ওয়াকিল অন্য পক্ষের সাথে মক্কেলের মতোই নিজ নামে কাজ সম্পাদন করতে পারবে। সরাসরি নিজ নামেই পণ্য ক্রয় করতে পারবে। তবে ব্যাংকের জন্য ওয়াকালাতের বিষয়টি প্রকাশ্য হওয়া উত্তম।

(গ) ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে আমদানিপ্রতিনিধি বানানো হলে সেই আমদানির জন্য এলসি খুলবে এবং বিদেশি বিক্রেতার নিকট মাল ক্রয়ের প্রস্তাব করবে। রপ্তানিকারকের নিকট এলসির শর্তাবলি গ্রহণযোগ্য হলে সে এই প্রস্তাব গ্রহণ করে নেবে। এতে করে

রপ্তানিকারকের সাথে ইজাব-কবুল (প্রস্তাব ও গ্রহণ) সম্পন্ন হয়ে ক্রয়চুক্তি সম্পাদিত হয়ে যাবে। ক্রয় চুক্তির দ্বারাই ব্যাংক উক্ত মালের মালিকানা অর্জন করবে। কিন্তু তখনও উক্ত মালের উপর ব্যাংকের (কবজা) দখল প্রতিষ্ঠিত হবে না। আর যে পর্যন্ত দখল প্রতিষ্ঠিত না হবে, ব্যাংক তা গ্রাহকের নিকট বিক্রি করতে পারবে না। অবশ্য যখন মালের জাহাজিকরণ সম্পন্ন হয়ে যাবে, তখন আমদানিকারক ব্যাংকের দখল প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। কেননা প্রচলিত আইন অনুযায়ী জাহাজকোম্পানি আমদানি কারকের উকিল হয়ে থাকে। তাই জাহাজিকরণ ডকুমেন্টস ব্যাংকের হস্তগত হলে ব্যাংক সংশ্লিষ্ট পণ্য গ্রাহকের নিকট মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রি করতে পারবে। এলসির টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন অনুযায়ী রপ্তানিকারক মাল জাহাজি-করণ করে এতদসংক্রান্ত যাবতীয় ডকুমেন্টস ও বিল ব্যাংকের নিকট পাঠিয়ে দেয় এবং পণ্যমূল্য নির্দিষ্ট ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করতে অনুরোধ করে। আন্তর্জাতিক ব্যবসার নিয়মানুযায়ী এলসি এট সাইট হলে ব্যাংক ডকুমেন্টস পাওয়ার পরপরই মূল্য পরিশোধ করতে বাধ্য। প্রচলিত আন্তর্জাতিক ব্যবসার রীতি অনুযায়ী মাল জাহাজিকরণের পর রপ্তানি-কারকের দায়িত্ব শেষ। তাই মাল জাহাজে উঠিয়ে দেওয়ার অর্থ তা আমাদানিকারকের প্রতিনিধিকে বুঝিয়ে দেওয়া। এ কারণে আমদানিকৃত মাল জাহাজিকরণের ডকুমেন্ট (Bill of Lading) বুঝে পাওয়া মাল বুঝে পাওয়ার শামিল। ইসলামি ব্যাংক বিদেশি বিক্রেতার সাথে ইজাব-কবুলের মাধ্যমে মালের মালিকানা অর্জন করে এবং জাহাজিকরণ ডকুমেন্ট প্রাপ্তির মাধ্যমে দখল লাভ করে। এভাবে মালিকানা অর্জন ও দখল লাভের পর আমদানিকৃত মাল গ্রাহকের নিকট বিক্রি করা শরিয়ত সম্মত। المعايير الشرعية তে উল্লেখ আছে,

يعتبر قبضا حكميا تسلم الموسسة أو وكيلها لمستندات الشحن عند شراء البضائع من الأسواق الخارجية وكذالك تسلمها لشهادات التخزين التي تعين البضائع من المخازن التي تدار بطرق مناسبة موثوق بها .

বৈদেশিক বাজার হতে মাল ক্রয় করা হলে ব্যাংক বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক জাহাজিকরণের ডকুমেন্টস বুঝে পাওয়া পণ্যের পরোক্ষ দখল ধর্তব্য হবে। অনুরূপ গুদামজাতকরণের এমন ডকুমেন্ট বুঝে পাওয়া, যার দ্বারা যথাযথ ও নির্ভরযোগ্য প্রক্রিয়ায় মাল শনাক্ত করা যায়, পরোক্ষ দখল বলে গণ্য হবে। (المعايير الشرعية শরিয়া স্ট্যান্ডার্ড মুরাবাহা অধ্যায়।)

তাই বিএল ডকুমেন্ট হস্তগত হওয়ার পর ব্যাংক তা গ্রাহকের নিকট মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রি করতে পারবে। এর পূর্বে মুরাবাহাচুক্তি সম্পাদিত হতে পারবে না। বিএল পৌঁছার পর মুরাবাহাচুক্তি সম্পাদিত হলে মালের মালিকানা গ্রাহকের কাছে চলে যাবে। কিন্তু যেহেতু শিপমেন্ট কোম্পানি আইনত আমদানিকারক তথা ব্যাংকের প্রতিনিধি, তাই মাল বন্দরে খালাস করা পর্যন্ত তা ব্যাংকের ঝুঁকিতেই থাকবে। শিপমেন্টস ডকুমেন্টস গ্রাহককে বুঝিয়ে দিলেও মালের ঝুঁকি ও দখল গ্রাহকের নিকট স্থানান্তরিত হবে না। পোর্ট হতে

খোলার জন্য ব্যাংকের শরণাপন্ন হয় তখন ব্যাংক সরাসরি উক্ত পণ্য বিক্রেতা হতে ক্রয় করে ক্রয়প্রত্যাশী গ্রাহকের নিকট বাকিতে মুরাবাহাপদ্ধতিতে বিক্রি করতে আগ্রহ প্রকাশ করে। এই উদ্দেশ্যে ব্যাংক ক্রয়প্রত্যাশী গ্রাহককে উক্ত পণ্য আমদানি করতে স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করে। তারপর যখন শিপিং ডকুমেন্ট ব্যাংকের হস্তগত হয় তখন সে উক্ত পণ্য ক্রয়প্রত্যাশী গ্রাহকের নিকট মুরাবাহা (বাকি) পদ্ধতিতে বিক্রি করে দেয়। মুরাবাহা অধ্যায়ে আলোচিত ব্যাংকিং মুরাবাহার সমস্ত বিধান এখানে প্রযোজ্য হবে।

যারা এই পদ্ধতির বৈধতার কথা বলেন, তাদের অভিমত অনুযায়ী এ কার্যক্রম শরিয়তের দৃষ্টিতে সহীহ হওয়ার জন্য নিম্নযুক্ত শর্তাবলি পাওয়া যাওয়া আবশ্যক।

এক.

ক্রেতা-বিক্রেতার সাথে এলসি খোলার পূর্বেই বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন করতে পারবে না। কেননা, ক্রেতা যদি পূর্বেই বিক্রেতার সাথে ক্রয়চুক্তি সম্পন্ন করে ফেলে তা হলে এই কার্যক্রমে ব্যাংকের জন্য ক্রেতা হিসেবে প্রবেশের কোনো সুযোগ নেই। এটা তখনই সম্ভব হবে যদি ক্রয়প্রত্যাশী গ্রাহক আর বিক্রেতার মাঝে কথাবার্তা দরকষাকষি বা ওয়াদার পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকবে। যদি তা এপর্যায় অতিক্রম করে চুক্তিপর্যায়ে চলে যায় তা হলে এক্ষেত্রে আর মুরাবাহা সম্ভব হবে না।

অবমুক্তকরণের পর গ্রাহক কর্তৃক তা বুঝে নেওয়ার পূর্বে গ্রাহক এই মাল অন্যকারো নিকট বিক্রি করতে পারবে না। উল্লেখ্য যে, যখন শিপমেন্টস ডকুমেন্টস ব্যাংকের নিকট পৌছে, তখন মাল সাধারণত দেশের বন্দরে এসে পৌছে না। এ পর্যায়ে বন্দরে পৌছা পর্যন্ত মালের যাবতীয় ঝুঁকি স্বাভাবিকভাবেই ব্যাংকের। ইন্সুরেন্সের প্রিমিয়াম পরিশোধকরণ মাল পোর্টে পৌছার পর অবমুক্তকরণের যাবতীয় ব্যবস্থাগ্রহণ ব্যাংকের দায়িত্ব। তবে এই সমস্ত কাজ সে প্রতিনিধির মাধ্যমে করতে পারবে। ব্যাংক বা প্রতিনিধির মাধ্যমে মাল বুঝে পাওয়ার পর তা গ্রাহকের নিকট বুঝিয়ে দিতে হবে। এরপর এই মালের ঝুঁকি গ্রাহকের উপর বর্তাবে।

উল্লেখ্য যে, পোর্ট থেকে খালাসের পর যদি মাল গ্রাহকের নিকট হস্তান্তর না করা হয় বা গ্রাহককে বুঝিয়ে না দেওয়া হয়, বরং ব্যাংক সে মাল নিজস্ব গুদামে সংরক্ষণ করে, তা হলে তা যথারীতি ব্যাংকের ঝুঁকিতে থাকবে।

দুই.
ব্যাংক ক্রেতা থেকে এলসি ফি নিতে পারবে না। কেননা, এক্ষেত্রে ব্যাংক সরাসরি নিজের জন্যই এলসি খুলে থাকে। অগত্যা যদি ব্যাংকের জন্য এলসি ফি আদায় করতে হয় তা হলে ব্যাংক তা মুরাবাহা ব্যয়ে শামিল করে নেবে।

তিন.
ডকুমেন্টপ্রাপ্তি এবং পণ্য হস্তগত করার পূর্বে উক্ত পণ্য ব্যাংকের জামানতে থাকবে। ক্রেতার জামানতে নয়। অতএব যদি পথিমধ্যে পণ্য নষ্ট হয় তা হলে ব্যাংকের মাল নষ্ট হবে। ব্যাংকের ক্ষতি সাব্যস্ত হবে।

চার.
বাকিতে কৃত মুরাবাহার সব শর্তের উপস্থিতি আবশ্যক, ফকিহগণের মতভিন্নতা সত্ত্বেও। এসব শর্তের বিস্তারিত আলোচনা আমরা ব্যাংকিং মুরাবাহা অধ্যায়ে করেছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার।

বিল অব এক্সচেঞ্জের ডিসকাউন্টিং-এর বিকল্প

উপরোক্ত লেনদেনে তৃতীয় সমস্যাটি হলো সুদভিত্তিক পদ্ধতিতে বিল অব এক্সচেঞ্জের ডিসকাউন্টিং। যেসব ব্যবসায়ী পণ্য বাকিতে বিক্রি করেন, তারা এ প্রয়োজনের সম্মুখীন হয়ে থাকেন। যদি বিক্রি এলসির মাধ্যমে হয় তা হলে এধরনের এলসিকে الاعتماد المؤجل। Usance L/C বলে। এমন হলে নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে পণ্যমূল্য উসুল সম্ভব নয়। কেননা, যে ব্যাংকে ক্রেতা এলসি খুলেছে সে ডকুমেন্টপ্রাপ্তির সাথে সাথে মূল্য প্রেরণ করবে না। বরং সে ক্রেতা হতে বিল অব এক্সচেঞ্জ সংগ্রহ করে নেবে, যাতে পরবর্তী কোনো তারিখে মূল্য পরিশোধের বিষয়টি উল্লেখ থাকবে। এক্ষেত্রে পণ্য প্রেরণ এবং রপ্তানিকারক বিক্রেতার নিকট মূল্য পৌঁছা এই দুয়ের মাঝে সময়সীমা থাকবে।

অন্যদিকে ব্যবসায়ী অন্যকোনো পণ্য ক্রয় করতে বা তৈরি করতে আগ্রহী, যাতে করে সে অন্যান্য ক্রেতার নিকট তা বিক্রি করতে পারে। এজন্য তার পণ্য তৈরী বা ক্রয়ের জন্য অর্থের প্রয়োজন। এজন্য সে ব্যাংকের শরণাপন্ন হয় এবং বিল অব এক্সচেঞ্জের ডিসকাউন্টিং-এর মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে।

উপরোক্ত প্রয়োজন এভাবে পূর্ণ করা সম্ভব যে, বিল হোল্ডার ব্যাংককে মেয়াদপূর্তির সময় ক্রেতা হতে মূল্য সংগ্রহ এবং তার নিকট তা পৌঁছানোর

দায়িত্ব দেবে। ব্যাংক এই সেবার বিনিময়ে বিল মালিক হতে পারিশ্রমিক দাবি করতে পারবে। তারপর বিল মালিক ব্যাংক হতে সুদবিহীন করযে হাসানাস্বরূপ অর্থ গ্রহণ করবে। বাকি এটা তখনই জায়েয হবে যদি করযের বিষয়টি ইজারাচুক্তির সাথে শর্তযুক্ত না হয় এবং মূল্য সংগ্রহের পারিশ্রমিক করযের পরিমাণের সাথে সম্পৃক্ত না হয়।

আর দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, যদি বিল হোল্ডারের অর্থের প্রয়োজন অন্যকোনো পণ্য ক্রয়ের জন্য হয়ে থাকে, তা হলে ব্যাংক সরাসরি তা ক্রয় করে বিল মালিকের নিকট বাকিতে মুরাবাহাপদ্ধতিতে বিক্রি করে দেবে। তবে এক্ষেত্রে মুরাবাহার সব শর্তের উপস্থিতি আবশ্যক।

এই অবস্থায় বিল অব এক্সচেঞ্জ ব্যাংকের নিকট মুরাবাহার ঋণের গ্যারান্টিস্বরূপ সংরক্ষিত থাকবে।

তবে শরয়ীদৃষ্টিকোণ থেকে এর আদর্শিক পদ্ধতি, যাতে শরয়ীচাহিদার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে, তা হলো, বিক্রেতা পণ্য বিক্রয়ের পূর্বেই ব্যাংকের সাথে শিরকাহ চুক্তি করে নেবে। আর তা এভাবে যে, ব্যাংক যে অর্থ দেবে তা মূলধনের অংশ গণ্য হবে। তারপর ক্রয় করে বা তৈরি করে বিক্রি করা হবে। এবং মুনাফা ব্যাংক ও বিক্রেতার মাঝে নির্ধারিত হারে বণ্টন হবে। তা হলে বিল অব এক্সচেঞ্জের ডিসকাউন্টিং-এর প্রয়োজনই হবে না।[৩৬]

---

৩৬. বিল অফ এক্সচেঞ্জের ডিসকাউন্টিং-এর বিকল্প পদ্ধতি

হযরত শায়খুল ইসলাম দামাত বারাকাতুহুম এ তিনটি বিকল্প পন্থা বুহুস ফি কাযায়া ফিকহিয়্যা মুআসারাতেও উল্লেখ করেছেন এবং সেখানে কিছুটা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। যথা :

এক. কোনো ব্যবসায়ী যখন বাকিতে পণ্য বিক্রি করে, তখনই কেবল তার বিল অফ এক্সচেঞ্জের ডিসকাউন্টিংয়ের প্রয়োজন পড়ে। সে বিল সমপরিমাণ বা এর কাছাকাছি অর্থ মেয়াদপূর্তির পূর্বেই নগদে পেতে চায়, যাতে করে সে ব্যবসায়ীদের পাওনা পরিশোধ করতে পারে, যাদের থেকে সে রপ্তানিকৃত পণ্য ক্রয় করেছে বা যাদের ফ্যাক্টরিতে তা তৈরি করিয়েছে।

এই প্রয়োজন পূরণকল্পে বিকল্প পদ্ধতি, যা শরয়ী নিরিখে সবধরনের আপত্তিমুক্ত, তা হলো ব্যবসায়ীগণ পণ্য রপ্তানির পূর্বেই ব্যাংকের সাথে মুশারাকাচুক্তি করে নেবে। এক্ষেত্রে যেহেতু বিদেশি ক্রেতার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্যের অর্ডার রয়েছে। উভয়ের সম্মতিতে মূল্যও নির্ধারিত হয়ে গেছে। পণ্য সংগ্রহ বাবদ কত ব্যয় হবে তাও জানা আছে। তাই বিশেষভাবে এই কাজে মুশারাকা করাতে তেমন ঝুঁকির কিছু নেই।

কেননা সম্ভাব্য মুনাফা যা এক্ষেত্রে অর্জিত হবে তা মোটামুটি নিশ্চিত। ব্যাংক খুব সহজেই তা আনজাম দিতে পারে। ব্যাংক গ্রাহককে মুশারাকার ভিত্তিতে অর্থ যোগান দিবে। তারপর অর্জিত মুনাফার নির্দিষ্ট হার নিয়ে নেবে। গ্রাহক ব্যাংকপ্রদত্ত অর্থ দ্বারা রপ্তানিতব্য পণ্য প্রস্তুতকরণ ব্যয় নির্বাহ করবে। তার প্রয়োজন পূরণ হবে এবং ব্যাংকেরও নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ হয়ে যাবে।

দুই. দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো ব্যাংক বিল মালিকের নিকট অন্যকোনো পণ্য এই বিলের বিনিময়ে বিক্রি করবে। ফিকহে মালেকি ও ফিকহে শাফেয়ি অনুযায়ী এই বিক্রয়ে কোনো সমস্যা নেই। এমনও হতে পারে যে, বিলে উল্লেখিত অর্থ সমপরিমাণ মূল্য নির্ধারণ করে পণ্য বিক্রি করবে। তারপর মূল্যপ্রাপ্তির জন্য বিল ইস্যুকারী কোম্পানির উপর হাওয়ালা করবে। আর এ হাওয়ালার ভিত্তিতে বিল অফ এক্সচেঞ্জ তার নিকট হস্তান্তর করবে। এখানে যেহেতু বিলের বিনিময় পণ্য তাই ব্যাংক বাজার মূল্য হতে অধিক মূল্যে তা বিক্রি করতে পারবে। এভাবে তার মুনাফার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। (আর উক্ত পণ্য বাজারে বিক্রি করলে গ্রাহকের নগদ অর্থের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।)

তিন. তৃতীয় পদ্ধতি হচ্ছে, ব্যাংক এবং বিল মালিক গ্রাহকের মাঝে ভিন্ন ভিন্ন দুটি চুক্তি সংঘটিত হবে। প্রথম চুক্তি হলো বিল অফ এক্সচেঞ্জের হামিল (গ্রাহক) ব্যাংককে (মেয়াদপূর্তির সময়) বিল ইস্যুকারী কোম্পানি থেকে অর্থ উসুল করার প্রতিনিধি বানাবে। আর এই সেবার বিনিময়ে ব্যাংককে সে পারিশ্রমিক দিবে। এটি ওয়াকালাচুক্তি হবে। আর দ্বিতীয় চুক্তি হলো, ব্যাংক গ্রাহককে বিলে উল্লেখিত অর্থ সমপরিমাণ তবে ওয়াকালাচুক্তির পারিশ্রমিক হ্রাসপূর্বক অবশিষ্ট অর্থ সুদবিহীন ঋণ দেবে। উদাহরণস্বরূপ, যায়েদ বিল মালিক, তার বিলে উল্লেখ করা অর্থের পরিমাণ এক লক্ষ টাকা। এখন যায়েদ বিল ইস্যুকারী কোম্পানি থেকে এই অর্থ উসুলের জন্য ব্যাংককে প্রতিনিধি বানালো। পারিশ্রমিক নির্ধারণ করল এক হাজার টাকা। তারপর ব্যাংক সম্পূর্ণ ভিন্ন চুক্তির ভিত্তিতে যায়েদকে নিরানব্বই হাজার টাকা ঋণ দিল। ব্যাংক যখন বিদেশি কোম্পানি হতে এক লক্ষ টাকা উসুল করবে তখন ব্যাংক তার পাওনা এই অর্থ থেকে বুঝে নেবে। ৯৯ হাজার টাকা প্রদত্ত ঋণ বাবদ নেবে আর এক হাজার টাকা ওয়াকালাচুক্তির পারিশ্রমিক হিসাবে নেবে। তবে এই পদ্ধতির বৈধতার জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলি আবশ্যক।

১. ওয়াকালাচুক্তি ও ঋণচুক্তি একটি অপরটি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক থাকতে হবে। একটি অপরটির সাথে শর্তযুক্ত থাকতে পারবে না। ঋণের মাঝে ওয়াকালার শর্ত থাকতে পারবে না। অনুরূপ ওয়াকালাচুক্তিতে ঋণের শর্ত থাকতে পারবে না।

২. ওয়াকালার চুক্তির পারিশ্রমিক বিলের মেয়াদপূর্তি সময়ের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারবে না। অতএব, মেয়াদপূর্তির সময় স্বল্প হলে পারিশ্রমিক কম হওয়া আর মেয়াদপূর্তি সময় বিলম্বিত/দূরবর্তী হলে পারিশ্রমিক বেশি হওয়া, এমন করা চলবে না। মেয়াদপূর্তির তারিখ যা-ই হোক, পারিশ্রমিক সর্বাবস্থায় সমান হতে হবে।

৩. ব্যাংক গ্রাহককে যে ঋণ সুবিধা দিচ্ছে এই ঋণের কারণে ওয়াকালাচুক্তির পারিশ্রমিক বাড়াতে পারবে না। যদি ঋণের কারণে ওয়াকালাচুক্তির পারিশ্রমিক বাড়িয়ে দেয় তা হলে তা كل قرض جر نفعا فهو ربوا (অর্থাৎ যে ঋণ কোনো সুবিধা বয়ে আনে তা সুদের অন্তর্ভুক্ত) এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (বুহুস ফি কাযায়া ফিকহিয়্যা মুআসারা, ২/৩৫-৩৭)

রপ্তানিবাণিজ্যের শরয়ী বিধান

এটি মূলত হযরত শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের একটি ভাষণের অনুবাদ, যা তিনি সেন্টার ফর ইসলামিক ইকোনোমিক্স-এর উদ্যোগে আয়োজিত এবং বায়তুল মুকাররম জামে মসজিদ, গুলশান ইকবাল, করাচিতে অনুষ্ঠিত রপ্তানিপ্রক্রিয়া শীর্ষক সেমিনারে প্রদান করেছিলেন।

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلوات والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

আজকের এই সেমিনারটি বিশেষভাবে রপ্তানি (এক্সপোর্ট) বিষয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আমাদের দেশে এ বিষয়টির উপর এটি সর্বপ্রথম সেমিনার। এই সেমিনারের মূল কারণ ও প্রধান উদ্দেশ্য হলো রপ্তানি সংক্রান্ত শরয়ী বিধান সম্পর্কে আলোকপাত করা।

বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার সময় নির্ধারণ (পয়েন্ট অব টাইম)

এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি আলোচনা করতে চাচ্ছি, তা হলো এক্সপোর্ট বা রপ্তানিপ্রক্রিয়ায় বিক্রয়চুক্তি সংঘটিত হওয়ার সময় নির্ধারণপ্রসঙ্গে। এ সময়টি নির্ধারণ শরয়ীদৃষ্টিকোণ থেকে আবশ্যক আর প্রচলিত আইন অনুযায়ীও জরুরি। ওই সুনির্দিষ্ট সময় কোনটি, যখন বাস্তবিক অর্থে বিক্রয়চুক্তি সংঘটিত হয়? অনুরূপ ওই সুনির্দিষ্ট সময় কোনটি যখন মালের ঝুঁকি রপ্তানিকারক থেকে আমদানিকারকের কাঁধে সমর্পিত হয়? এসব সময় নির্ধারণ একারণে আবশ্যক যে, আইনকানুন ও বহু শরয়ী মাসআলার উপর এর দারুণ প্রভাব রয়েছে। এ সময় নির্ধারণের জন্য দুটি বিষয়ের মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট থাকা অতীব জরুরি।

বিক্রয় ও বিক্রয়ের অঙ্গীকারের মাঝে পার্থক্য

বিক্রয় (সেল) ও বিক্রয়ের অঙ্গীকার (এগ্রিমেন্ট টু সেল)– এ দুটি বিষয়ের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট থাকা আবশ্যক। অন্যথায় রপ্তানির মাসআলা বিশুদ্ধরূপে বুঝা যাবে না। শরিয়তের দৃষ্টিতে বিক্রয় ও বিক্রয়ের অঙ্গীকার দুটি সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়। তা ছাড়া আইনগতভাবেও সেল (Sale) এবং এগ্রিমেন্ট টু সেল প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র বিষয়। তবে কন্ট্রাক (Contract) বা চুক্তি শব্দটি আমাদের সমাজের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এজন্য কন্ট্রাক্ট বা চুক্তি বলা হলে বিক্রয়চুক্তি (সেল)-ও উদ্দেশ্য হতে পারে। অনুরূপ এগ্রিমেন্ট

টু সেলও উদ্দেশ্য হতে পারে। অথচ উভয় কন্ট্রাক্ট (চুক্তির) মাঝে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্য শরিয়তের আলোকে এবং আইনের নিরিখে উভয় প্রক্রিয়ায় নির্ণয় করা জরুরি। এ পার্থক্য সম্পর্কে অবগত থাকা আবশ্যক।

প্রথম পার্থক্য

প্রথম পার্থক্য হলো, যখন এগ্রিমেন্ট টু সেল অর্থাৎ উভয়পক্ষ বিক্রির অঙ্গীকার করবে, তখন এই অঙ্গীকারের কারণে এগ্রিমেন্ট টু সেলকৃত পণ্যের মালিকানা ক্রেতা লাভ করবে না। এটি কেবল ভবিষ্যৎবিক্রির পারস্পরিক অঙ্গীকার বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ বিক্রেতা (সেলার) বলেছে, আমি ক্রেতাকে পণ্য সরবরাহ করব আর ক্রেতা বলল, আমি মূল্য পরিশোধ করে দেবো। কিন্তু শুধু এই অঙ্গীকারের কারণে একে অপরের মালিকানা বস্তুর স্বত্ব লাভ করবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত মূল বিক্রয়চুক্তি সংঘটিত না হবে।

দ্বিতীয় পার্থক্য

দ্বিতীয় পার্থক্য হলো, প্রচলিত আইন অনুযায়ী যখন কোনো জিনিসের বিক্রি (সেল) সংঘটিত হয়ে যাবে তখন এই বিক্রির কারণে ক্রেতা কেবল ক্রয়কৃত পণ্যের মালিকানা স্বত্বই লাভ করবে না; বরং সাধারণ অবস্থায় এই সম্পদের সবধরনের ঝুঁকিও (রিস্ক) ক্রেতার উপর অর্পিত হবে, যেমন : আমি একটি টেপরেকর্ডার ক্রয় করলাম। কিন্তু এখনও বিক্রেতা হতে এই টেপরেকর্ডারের দখল বুঝে পাইনি। বিক্রেতার নিয়ন্ত্রণেই এখনও তা রয়ে গেছে। কিন্তু বিক্রি সংঘটিত হয়ে গেছে। তা হলে এ বিক্রির কারণে এ টেপরেকর্ডারের মালিকানা তো আমি লাভ করব। কিন্তু দখল বুঝে নেওয়া পর্যন্ত এর কোনো ঝুঁকি বা দায় আমার উপর বর্তাবে না। বিক্রেতার দখলে থাকা অবস্থায় তা নষ্ট হয়ে গেলে কিংবা চুরি হয়ে গেলে সে ক্ষতি আমার হবে না। তা বিক্রেতার ক্ষতি সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে প্রচলিত দেশীয় আইন অনুযায়ী বিক্রয়চুক্তি সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে মালিকানা স্বত্ব লাভের পাশাপাশি এ টেপরেকর্ডারের সবধরনের ঝুঁকি বা দায় দায়িত্ব আমার উপর বর্তাবে। উক্ত সম্পদ বিক্রেতার দখলে থাকা অবস্থায়ও যদি ধ্বংস হয়ে যায়, বা চুরি হয়ে যায়, কিংবা নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে আমার ক্ষতি সাব্যস্ত হবে; বিক্রেতার কিছুই হবে না। কেননা প্রচলিত আইন আনুযায়ী পণ্যের রিস্ক (ক্ষতি বা দায়) স্থানান্তরিত হওয়া দখল লাভের উপর নির্ভরশীল নয় বরং

যখনই মালিকানা সাব্যস্ত হবে সাথে সাথেই সবধরনের দায়িত্ব ও ক্ষতির দায় তার উপরই বর্তাবে। ইসলামি আইন অনুযায়ী বিষয়টি এমন নয়। ইসলামি আইনে দুটি বিষয় ভিন্ন ভিন্ন। একটি হলো মালিকানা লাভ করা বা মালিকানা স্থানান্তরিত হওয়া আর দ্বিতীয় বিষয় হলো ঝুঁকি বা দায়িত্ব স্থানান্তরিত হওয়া। ইসলামি শরিয়তের বিধান হলো, কেবল বিক্রয়চুক্তি সংঘটিত হওয়ার দ্বারা মালিকানা তো চলে যাবে। ক্রেতার মালিকানা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। কিন্তু বিক্রীত জিনিসের উপর ক্রেতার দখল প্রতিষ্ঠা লাভের পূর্বপর্যন্ত এর সম্পূর্ণ দায়ভার বিক্রেতার থেকে যাবে। অতএব উল্লিখিত উদাহরণে টেপরেকর্ডারটির উপর যতক্ষণ পর্যন্ত আমার দখল প্রতিষ্ঠিত না হবে কিংবা আমার কোনো প্রতিনিধির দখল লাভ না হবে, প্রত্যক্ষ দখল হোক কিংবা পরোক্ষ দখল, সে পর্যন্ত এই পণ্যের ঝুঁকি আমার উপর বর্তাবে না। এটিই হলো প্রচলিত আইন ও শরয়ী আইনের পার্থক্য।[৩৭]

তৃতীয় পার্থক্য

তৃতীয় পার্থক্য হলো, যদি কোনো জিনিসের বিক্রয়চুক্তি সংঘটিত না হয়, কেবল এগ্রিমেন্ট টু সেল তথা বিক্রির জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। আর এই অঙ্গীকারের পর বিক্রেতা উক্ত জিনিস তৃতীয় কোনো ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে দেয়, তা হলে এ কথা তো বলা যাবে যে, সে চারিত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি মন্দ কাজ করেছে, কিন্তু আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে তৃতীয় ব্যক্তির নিকট তার এই বিক্রি বিশুদ্ধ বিবেচিত হবে। ক্রেতা এ জিনিসের মালিকানাও লাভ করবে। যেমন : আমি অঙ্গীকারাবদ্ধ হলাম খালেদ থেকে টেপরেকর্ডারটি ক্রয় করব। আর খালেদ অঙ্গীকার করল, সে টেপরেকর্ডারটি আমার নিকট বিক্রি করবে। তবে কেবল এগ্রিমেন্ট টু সেলই হয়েছে। সেল তথা বিক্রয় সংঘটিত হয়নি। পরবর্তী সময়ে খালেদ টেপরেকর্ডারটি আমার নিকট বিক্রি না করে যায়েদের নিকট বিক্রি করে দিল। তা হলে একথা তো বলা হবে যে, খালেদ অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। চারিত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি মন্দ কাজ করেছে কিন্তু আইনগতভাবে যায়েদ টেপরেকর্ডারটি মালিক হয়ে যাবে। এখন যায়েদকে একথা বলার অধিকার আমার নেই যে, টেপরেকর্ডারটি আমার।

---

১৫. এটি মূলত বিক্রয়চুক্তি সংঘটিত হওয়ার পর প্রচলিত আইন ও শরয়ি আইনের পার্থক্য। সেল (বিক্রয়চুক্তি) ও এগ্রিমেন্ট টু সেলের (বিক্রয়চুক্তির অঙ্গীকার) পার্থক্য নয়।

তুমি কেনো তা ক্রয় করলে? অবশ্য খালেদকে একথা বলার অধিকার আমার রয়েছে, 'তুমি আমার সাথে কৃত-ওয়াদা ভঙ্গ করেছ।' যদি এই ওয়াদা ভঙ্গের কারণে আমার কোনো ক্ষতি হয়, তা হলে আমি ক্ষতিপূরণও দাবি করতে পারব। কিন্তু এ ছাড়া একথা বলার অধিকার আমার নেই যে, তুমি টেপরেকর্ডারটি যায়েদ থেকে ফিরিয়ে এনে আমার নিকট হস্তান্তর কর। অবশ্য যদি প্রকৃত অর্থে বিক্রয়চুক্তি সংঘটিত হয়ে যেত আর খালেদ যায়েদের নিকট তা পুনরায় বিক্রি করে দিত, তা হলে আমার উপরোক্ত কথা যুক্তিসঙ্গত হতো। কেননা এই অবস্থায় বিক্রয়চুক্তি হয়ে যাওয়ার কারণে মালিকানা অধিকার পূর্বেই প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। এজন্য এই দাবি করা যে, টেপরেকর্ডারটি আমার, আমাকে তা হস্তান্তর করো– এটা যুক্তিসঙ্গত দাবি। তা ছাড়া এরূপ হলে দ্বিতীয় চুক্তি সংঘটিতই হবে না।

চতুর্থ পার্থক্য

সেল এবং এগ্রিমেন্ট টু সেলের মাঝে চতুর্থ পার্থক্য হলো, যদি কোনো পণ্যে সেল তথা বিক্রয়চুক্তি সংঘটিত না হয়; কেবল এগ্রিমেন্ট টু সেল অর্থাৎ বিক্রির অঙ্গীকার হয়, তুমি এই পণ্যটি আমার নিকট বিক্রি করবে। এই অবস্থায় যদি বিক্রেতা দেউলিয়া হয়ে যায় তা হলে ক্রেতা একথা বলতে পারবে না যে, ওই জিনিসটি আমি ক্রয় করেছি। অতএব তা আমাকে হস্তান্তর করা হোক। বরং তা যথারীতি বিক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হবে এবং আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য জিনিসের সাথে এটিও বিক্রি করা হবে এবং বিক্রেতার ঋণ পরিশোধ করা হবে। কিন্তু যদি প্রকৃত বিক্রি সংঘটিত হয়ে যেতো, তা হলে ক্রেতা তা নিজে দখলে নিতে পারতো। কেননা বিক্রেতা দেউলিয়া হওয়ার পূর্বেই সে তা ক্রয় করে নিয়েছে। শরয়ী বিধান অনুযায়ীও এই পার্থক্য কার্যকর আর প্রচলিত আইন অনুযায়ীও তা ফলপ্রসূ।

এই হলো বিক্রয় এবং বিক্রয়ের অঙ্গীকারের মধ্যে কতিপয় মৌলিক পার্থক্য। এসব মৌলিক পার্থক্য সামনে রেখে আমরা এক্সপোর্ট তথা রপ্তানিপ্রক্রিয়ার শরয়ীবিশ্লেষণ পেশ করব।

অর্ডারের সময় পণ্যের অবস্থা

প্রথমে আমরা বিদেশি কোনো আমদানিকারকের পক্ষ থেকে পণ্য রপ্তানির অর্ডার পেয়ে থাকি। এরপর পণ্য রপ্তানি করি। তো অধিকাংশ সময়ই অর্ডার

নেওয়ার সময় পণ্য আমাদের নিকট উপস্থিত বা প্রস্তুত থাকে না; বরং কখনও তা নিজস্ব ফ্যাক্টরিতে তৈরি করা হয় আবার অন্যদের মাধ্যমেও তা প্রস্তুত করাতে হয়, আবার কখনও তা মার্কেট থেকে ক্রয় করতে হয়। অবশ্য কখনও তা পূর্ব হতে প্রস্তুত করা থাকে।

যদি অর্ডার নেওয়ার সময় পণ্য প্রস্তুত থাকে

যদি রপ্তানিযোগ্য পণ্য পূর্ব হতেই আমাদের নিকট প্রস্তুত থাকে, তা হলে এই অবস্থায় আমদানিকারকের সাথে এগ্রিমেন্ট টু সেল করার প্রয়োজন নেই। বরং তখনই পণ্য সেল করা যাবে। বলা যাবে আমি তোমার নিকট এ পণ্য বিক্রি করলাম। ক্রেতা বলবে আমি ক্রয় করলাম। এভাবে বিক্রয়চুক্তি হলে শরয়ীদৃষ্টিকোণ থেকে কোনো সমস্যা নেই।

যদি অর্ডার নেওয়ার সময় পণ্য প্রস্তুত না থাকে

আর যদি পণ্য পূর্ব থেকে আমাদের নিকট প্রস্তুত না থাকে বরং সে পণ্য নিজেদের তৈরি করতে হবে কিংবা অন্যের মাধ্যমে তৈরি করাতে হবে অথবা তা মার্কেট থেকে ক্রয় করতে হবে তা হলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী এই পণ্য বিক্রি করতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা প্রচলিত আইন অনুসারে বিক্রেতা যে পণ্য বিক্রি করবে তা উপস্থিত থাকা, বিক্রেতার মালিকানায় থাকা এবং দখলে থাকার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এ কারণেই 'ফরওয়ার্ড সেলে' আইনগতভাবে দোষের কিছু নেই। কিন্তু শরিয়তের বিধানমোতাবেক যে জিনিস বিক্রি করা হবে তা প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। অনুরূপ তা বিক্রেতার মালিকানায় থাকা এবং তার দখলে থাকা আবশ্যক, প্রকৃত দখল হোক কিংবা আইনগত ও সমাজে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী দখলে হোক।[৩৮]

---

১৬. ক্রয়-বিক্রয়ের কিছু মৌলিক বিধান

শরিয়তের দৃষ্টিতে ক্রয়-বিক্রয় বলা হয় কোনো মূল্যমানবিশিষ্ট বস্তুকে অপর মূল্যমানবিশিষ্ট বস্তুর বিনিময়ে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে আদান-প্রদানকে। এখানে ক্রয়-বিক্রয়ের কিছু মৌলিক বিধান উল্লেখ করা হল।

বিধান : এক

যে পণ্য বিক্রি করা হবে তা বিক্রির সময় বিদ্যমান থাকতে হবে। অতএব যে পণ্য এখনো অস্তিত্ব লাভ করেনি তা বিক্রি করা যাবে না। সুতরাং অস্তিত্বহীন পণ্যের বিক্রয়

পারস্পরিক সম্মতিতে হলেও তা বৈধ নয়। শরিয়তের দৃষ্টিতে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

উদাহরণত যদি 'ক' তার গাভির বাচ্চা, যা এখনো জন্ম লাভ করেনি, 'খ'-এর নিকট বিক্রি করে, তা হলে তা বাতিল সাব্যস্ত হবে।

বিধান : দুই

যে পণ্য বিক্রি করা হবে তা বিক্রির সময় বিক্রেতার মালিকানায় থাকতে হবে। অতএব, যে পণ্য বিক্রেতার মালিকানায় নেই; তা বিক্রি করা যাবে না। যদি মালিকানা প্রতিষ্ঠার পূর্বে বিক্রি করা হয় তা হলে তা শরিয়তের দৃষ্টিতে বাতিল বলে গণ্য হবে।

উদাহরণত 'ক' 'খ'-এর নিকট একটি গাড়ি বিক্রি করছে, যা 'গ'-এর মালিকানায় রয়েছে কিন্তু 'ক' আশাবাদী যে, সে তা 'গ' থেকে ক্রয় করে 'খ'-এর নিকট হস্তান্তর করতে পারবে। যেহেতু বিক্রির সময় তা 'ক'-এর মালিকানায় ছিল না, তাই শরিয়তের দৃষ্টিতে এই বিক্রয় বাতিল বলে গণ্য হবে।

বিধান : তিন

যে পণ্য বিক্রি করা হবে, বিক্রয়ের সময় তা বিক্রেতার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ দখলে (কবজায়) থাকতে হবে। পরোক্ষ দখল (কবজা) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দখলকারী (কবজাকারী) ব্যক্তি বাহ্যদৃষ্টিতে পণ্য নিজ অধীনে নেয়নি, কিন্তু বাস্তবে তা তার দখলে এসে গেছে, পণ্যের যাবতীয় দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত হয়ে গেছে। যার ফলে পণ্য নষ্ট হয়ে যাওয়া বা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিও তার উপর চেপে গেছে। এখন যদি তা ধ্বংস হয়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় তা হলে ক্রেতার ক্ষতি হবে। বিক্রেতার কিছুই হবে না।

১. উদাহরণত 'ক' 'খ' থেকে একটি গাড়ি ক্রয় করল; কিন্তু 'খ' এখনো 'ক' বা তার প্রতিনিধিকে গাড়িটি হস্তান্তর করেনি; তা হলে এই অবস্থায় 'ক' এই গাড়িটি অন্যকারো নিকট বিক্রি করতে পারবে না। যদি সে গাড়িটি নিজ দখলে (নিয়ন্ত্রণে) নেওয়ার পূর্বেই বিক্রি করে দেয় তা হলে এই বেচাকেনা শুদ্ধ হবে না।

২. 'ক' 'খ' থেকে একটি নির্দিষ্ট গাড়ি ক্রয় করেছে। 'খ' ওই নির্দিষ্ট গাড়িটি এমন এক গ্যারেজে রেখে দিয়েছে, যেখানে 'ক'-এর স্বাধীনভাবে প্রবেশের অনুমতি রয়েছে। আর 'খ' কর্তৃক তাকে এই অনুমতিও প্রদান করা হয়েছে যে, সে গাড়িটি যখন খুশি, যেখানে খুশি নিয়ে যেতে পারে তা হলে এই অবস্থায় গাড়িটির দায়ভার 'ক'-এর উপর ন্যস্ত হয়ে গেছে। এখন গাড়িটির উপর ক্রেতার পরোক্ষ দখল ও নিয়ন্ত্রণ (কবজা) (Constructives Posses) প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। এখন যদি 'ক' গাড়িটির উপর বাহ্যনিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পূর্বেই অন্যকারো নিকট বিক্রি করে দেয়, তা হলে শরিয়তের দৃষ্টিতে এই বিক্রয় শুদ্ধ হবে।

উল্লিখিত তিন বিধানের সারকথা

১নং থেকে ৩নং বিধানের সারকথা হলো কোনো ব্যক্তি এমন জিনিস বিক্রি করতে পারবে না :

১. যা এখনো অস্তিত্বে আসেনি,

২. যা অস্তিত্ব লাভ করেছে, কিন্তু বর্তমানে তা বিক্রেতার মালিকানায় নেই বা এখনো তাতে বিক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

৩. যে পণ্যে বিক্রেতার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ দখল (কব্জ) নেই।

বিধান : চার

মূল্য নির্ধারণ করাও বিক্রি শুদ্ধ হওয়ার জন্য অপরিহার্য শর্ত। মূল্য নির্ধারিত না হলে ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হবে না।

উদাহরণস্বরূপ 'ক' 'খ' কে বলল, এক মাসের মধ্যে পরিশোধ করা হলে মূল্য পঞ্চাশ টাকা আর যদি দুই মাসের মধ্যে পরিশোধ করা হয় তা হলে মূল্য পঞ্চান্ন টাকা। এক্ষেত্রে ক্রেতা যদি কোনোটি নির্ধারণ করা ছাড়াই সম্মতি প্রকাশ করে, তা হলে মূল্য অনির্ধারিত থাকায় এই বিক্রি শুদ্ধ হবে না। তবে যদি বিক্রয়ের সময়ই যেকোনো একটি নির্ধারণ করে নেওয়া হয় অর্থাৎ এক মাসে পরিশোধ করা হবে, না দুই মাসে পরিশোধ করা হবে, তা হলে মূল্য নির্ধারিত হয়ে যাওয়ায় এই বিক্রয় শুদ্ধ হবে।

বিধান : পাঁচ

বাইয়ে মুয়াজ্জাল, (বাকিতে মূল্য পরিশোধের ভিত্তিতে বিক্রয়)

১. যে ক্রয়-বিক্রয়ের উভয় পক্ষ এই কথার উপর একমত হয় যে, মূল্য পরবর্তী সময়ে আদায় করা হবে, তাকে পরিভাষায় 'বাইয়ে মুয়াজ্জাল' বলে।

২. বাইয়ে মুয়াজ্জালও শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ। তবে শর্ত হলো মূল্য পরিশোধের তারিখ নির্ধারিত হতে হবে। এতে কোনোপ্রকার অস্পষ্টতা থাকতে পারবে না।

৩. মূল্য পরিশোধের সময়, নির্দিষ্ট তারিখ হিসাবেও নির্ধারণ করা যেতে পারে (যেমন : পহেলা জানুয়ারি পরিশোধ করা হবে) এবং নির্দিষ্ট সময় হিসাবেও হতে পারে, যেমন : তিন মাস পর পরিশোধ করা হবে। কিন্তু মূল্য পরিশোধের সময় ভবিষ্যতের এমন কোনো ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করে নির্ধারণ করা যাবে না, যার চূড়ান্ত তারিখ অজ্ঞাত ও অনিশ্চিত। যদি পরিশোধের তারিখ অনির্দিষ্ট কিংবা অনিশ্চিত হয়, তা হলে বিক্রয় শুদ্ধ হবে না।

৪. যদি মূল্য পরিশোধের জন্য একটি বিশেষ সময় নির্ধারণ করা হয়, যেমন : এক মাস, তা হলে সে সময়ের হিসাব ক্রেতা কর্তৃক বিক্রীত পণ্য হস্তগত করার সময় থেকে শুরু হবে। তবে উভয়পক্ষ যদি অন্যকোনো সময়ের উপর একমত হয়ে যায়, তা হলে সে হিসাবে হবে।

৫. বাকির ক্ষেত্রে মূল্য নগদ অপেক্ষা অধিকও হতে পারে; তবে চুক্তির সময়ই তা নির্ধারণ করা জরুরি।

এখন মাসআলা হলো যদি কোনো জিনিস আমাদের নিকট প্রস্তুত অবস্থায় না থাকে অথচ আমরা সে পণ্যের অর্ডার পেলাম, তা হলে এক্ষেত্রে আমাদের কর্মপন্থা কী হবে? এর উত্তর হলো, এই অবস্থায় আমরা আমদানিকারকের সাথে সেল (বিক্রয়) চুক্তি করব না, বরং এগ্রিমেন্ট টু সেল অর্থাৎ ভবিষ্যতবিক্রির অঙ্গীকার করব। তবে এক্ষেত্রে ওইসব শর্তের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে, যেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ আমরা ইতিপূর্বে পেশ করেছি।

এখন প্রশ্ন হলো, যদি আমাদের কাছে ভিনদেশি কোনো ক্রেতার পক্ষ থেকে এমন পণ্যের অর্ডার আসে, যা আমাদের নিকট উপস্থিত নেই, ফলে আমরা তার সাথে এগ্রিমেন্ট টু সেল করেছি। তো এ এগ্রিমেন্ট সেল প্রকৃত 'সেলে' কখন পরিণত হবে। আর কখন আমরা বলতে পারব। সেল তথা প্রকৃত বিক্রি সংঘটিত হয়ে গেছে। এবং পণ্যের মালিকানা ক্রেতা লাভ করেছে। আর কখন উক্ত পণ্যের রিস্ক (ঝুঁকি ও দায়) ক্রেতার উপর অর্পিত হবে?

উত্তর হলো, এগ্রিমেন্ট টু সেলের পর যখন আমরা অর্ডারকৃত পণ্য মার্কেট থেকে ক্রয় করে নেবো, বা সে পণ্য নিজেরা তৈরি করব, কিংবা অন্যকারও মাধ্যমে তা তৈরি করে নেব এবং সে পণ্যের উপর আমাদের দখল প্রতিষ্ঠা হবে। মোটকথা, আমরা এমনপর্যায়ে পৌঁছে যাবো যে, যেকোনো মুহূর্তে আমরা পণ্য আমদানিকারকের নিকট পাঠাতে সক্ষম এবং পণ্য শিপমেন্টে সক্ষম, তখন আমরা প্রকৃত সেল করব।

এক্ষেত্রে প্রকৃত সেলের দুটি পদ্ধতি হতে পারে

এক

অর্ডারকৃত পণ্য তৈরি হয়ে যখন তা আমাদের দখলে চলে আসবে তখন আমরা আমদানিকারককে নতুন করে বিক্রি প্রস্তাব (অফার) দেবো। এ অফার ফোন, ফ্যাক্স, টেলিগ্রাফ বা অন্য যেকোনো যোগাযোগমাধ্যমে হতে পারে। ক্রেতা এই প্রস্তাব (অফার) গ্রহণ করে নিলে প্রকৃত বিক্রি সংঘটিত হয়ে যাবে।

---

৬. একবার যে মূল্য নির্ধারিত হয়ে যায়, নির্ধারিত সময়ের পূর্বে পরিশোধের কারণে তা হতে কম করা যাবে না। তেমনি নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বে পরিশোধের কারণে তার পরিমাণও বাড়ানো যাবে না।

দুই

কখনও মৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে প্রস্তাব পেশ (ইজাব) ও প্রস্তাব গ্রহণ (কবুল) করা ব্যতীত লেনদেনের উদ্দেশ্যে পণ্য হস্তান্তর দ্বারাই বিক্রয়চুক্তি সংঘটিত হয়ে যায়। একে পরিভাষায় بيع التعاطي বা লেনদেনের মাধ্যমে বিক্রি বলে। তো এখানে যেহেতু পূর্বেই ক্রেতার সাথে এগ্রিমেন্ট টু সেল হয়েছে, আর এখন পণ্য তৈরি হয়ে তা আমাদের হাতে আসার পর আমরা তা ক্রেতা (আমদানিকারক) বরাবর পাঠিয়ে দিয়েছি। এক্ষেত্রে আমরা যখন উক্ত পণ্য শিপিং কোম্পানির নিকট হস্তান্তর করেছি, তখন এ হস্তান্তর কার্যক্রম কর্মকেন্দ্রিক (عملي وفعلي) ইজাব কবুলে পরিণত হয়েছে। আর تعاطي তথা লেনদেনের মাধ্যমে বিক্রয়চুক্তি সংঘটিত হয়েছে। (কেননা আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী শিপিং কোম্পানি আমদানিকারকের প্রতিনিধি), তা ছাড়া বিক্রয়চুক্তি সংঘটিত হওয়ার পাশাপাশি পণ্যের উপর ক্রেতার দখলও সাব্যস্ত হয়ে গেছে। কেননা শিপিং কোম্পানি আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রেতার প্রতিনিধি (وكيل) হয়ে পণ্যের দখল বুঝে নেয়; তাই এ পর্যায়ে পণ্যের রিস্ক (ঝুঁকি) ও ক্রেতার (আমদানিকারক) উপর সমর্পিত হয়ে গেছে (বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে)।

সারকথা অর্ডারের সময় যদি পণ্য তৈরী অবস্থায় রপ্তানিকারকের নিকট থাকে, তা হলে তো তাৎক্ষণিক বিক্রয়চুক্তি সংঘটিত হয়ে যাবে। আর যদি তখন পণ্য উপস্থিত না থাকে, তা হলে সে সময় এগ্রিমেন্ট টু সেল করতে হবে। পরবর্তী সময়ে যখন পণ্য তৈরি হয়ে যাবে এবং রপ্তানিকারক কর্তৃক তা শিপিং কোম্পানির নিকট হস্তান্তর করা হবে তখন প্রকৃত বিক্রয়চুক্তি সংঘটিত হবে। এক্ষেত্রে পয়েন্ট অব টাইম এটি।

পণ্যের রিস্ক (দায়ভার) কখন আমদানিকারকের উপর ন্যস্ত হবে?

রপ্তানিপ্রক্রিয়ায় দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, রপ্তানিপণ্যের দায়ভার কখন আমদানিকারকের উপর ন্যস্ত হবে সেই সময় নির্ধারণ করা। তো কথা হলো, রপ্তানিপণ্যের শিপমেন্টের সাধারণত তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। এ তিন পদ্ধতির কোনো একটি অবলম্বন করে পণ্য জাহাজিকরণ করে তা আমদানিকারকের নিকট পাঠাতে হয়।

এক. এফওবি (FOB)

দুই. সি অ্যান্ড এফ (C and F)

তিন. সিআইএফ (CIF)

প্রথম (FOB ফ্রি অন বোর্ড) পদ্ধতিতে এক্সপোর্টারের দায়িত্ব কেবল শিপিং কোম্পানির নিকট পণ্য পৌঁছে দেওয়া। শিপিং কোম্পানির প্রাপ্য ভাড়া ও অন্যান্য ব্যয় ইমপোর্টকারী বহন করবে। এ পদ্ধতিতে শিপিং কোম্পানি ইমপোর্টকারীর এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে থাকে। তাই যখন শিপিং কোম্পানি এই মালের ডেলিভারি বুঝে নেবে তখন কোম্পানির এ বুঝে নেওয়া ইমপোর্টকারীর দখল হিসাবে গণ্য হবে এবং ওই সময় থেকেই মালের রিস্ক-দায়ভার ইমপোর্টকারীর উপর ন্যস্ত হবে। তখন থেকে এই মালের কোনো ক্ষতি হলে সম্পূর্ণ দায়িত্ব ক্রেতার (ইমপোর্টকারীর) উপর বর্তাবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি অর্থাৎ (C and F কস্ট অ্যান্ড ফ্রেইট)[৩৯] পদ্ধতিতে যদি পণ্য পাঠানো হয়, তা হলে পণ্য পাঠাবার ভাড়া এক্সপোর্টকারী (বিক্রেতা) বহন করে থাকে। ব্যবসায়ীদের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সিঅ্যান্ডএফ-পদ্ধতিতে শিপিং কোম্পানি ইমপোর্টাকারীর (ক্রেতার) এজেন্ট ও প্রতিনিধি গণ্য হয়। এখন প্রশ্ন হলো শরিয়তের দৃষ্টিতে এর বিধান কী?

আমরা এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য আলেমদের বিশেষ কনফারেন্স ডেকেছিলাম। উক্ত কনফারেন্সে আলোচনা-পর্যালোচনার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, ব্যবসায়ীসমাজে প্রচলিত এ রীতি মেনে নিতে শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো আপত্তি নেই। অর্থাৎ দ্বিতীয় পদ্ধতিতে পণ্য প্রেরণ ভাড়া এক্সপোর্টকারীর আদায় করা সত্ত্বেও শিপিং কোম্পানিকে ইমপোর্টকারীর

---

৩৯. এই পদ্ধতিটি এখানে সিএন্ডএফ নামে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু فقه البيوع তে হযরত এ পদ্ধতিকে সিএফআর CFR নামে উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত CFR নামটিই সঠিক। তা ছাড়া C and F বলা হয় ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিংকে। আমদানিকৃত পণ্য শুল্ককর্তৃপক্ষ, বন্দর কর্তৃপক্ষ ও জাহাজ কর্তৃপক্ষের সকল আনুষ্ঠাকিতা পালনপূর্বক ডেলিভারি নেওয়াকে ক্লিয়ারিং বলে। অনুরূপ রপ্তানিকৃত পণ্য সকল আনুষ্ঠানিকতা পালনপূর্বক বিদেশে প্রেরণ করাকে ফরওয়ার্ডিং বলে। রপ্তানিযোগ্য মাল ও আমদানিকৃত পণ্য বন্দর ও শুল্ক কর্তৃপক্ষ এবং পরিবহণ কর্তৃপক্ষের সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে পণ্য প্রেরণ ও ডেলিভারির যথাযথ ব্যবস্থাগ্রহণের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে সিএন্ডএফ এজেন্ট বলে। আমাদের দেশের আমদানি রপ্তানি সাধারণত সিএন্ডএফ এজেন্টের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। —অনুবাদক।

এজেন্ট গণ্য করা হবে। অতএব, এই পদ্ধতিতেও যখন এক্সপোর্টকারী শিপিং কোম্পানিকে মাল হস্তান্তর করবে তখন থেকে মালের দায়ভার ইমপোর্টকারীর (ক্রেতার) উপর প্রবর্তিত হবে।

আর যদি তৃতীয় পদ্ধতি অর্থাৎ (CIF কস্ট ইন্সুরেন্স অ্যান্ড ফ্রেইট) সিআইএফ-পদ্ধতিতে পণ্য প্রেরণ করা হয়, যেহেতু তৃতীয় পদ্ধতিও দ্বিতীয় পদ্ধতির ন্যায় পণ্য বহন ব্যয় এক্সপোর্টার বহন করে থাকে; শুধু এতটুকু পার্থক্য যে, এই পদ্ধতিতে এক্সপোর্টকারীর ইমপোর্টকারীর অনুকূলে মালের বীমা করিয়ে থাকে, যা দ্বিতীয় পদ্ধতিতে করা হয় না। বলাবাহুল্য, এ বীমার সুফলও ক্রেতা তথা আমদানিকারকই ভোগ করে থাকে। এক্সপোর্টকারীর মালের বীমা করিয়ে শিপিং কোম্পানির নিকট হস্তান্তর করে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায়। তাই এ পদ্ধতির বিধানও দ্বিতীয় পদ্ধতির ন্যায় হবে, অর্থাৎ শিপিং কোম্পানি আমদানিকারকের এজেন্ট সাব্যস্ত হবে।

সারকথা, ব্যবসায়ীসমাজে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী FOB, C and F ও CIF এই তিন পদ্ধতিতেই মাল শিপমেন্টের সাথে সাথেই মালের রিস্ক ও দায়িত্ব শরিয়তের বিধানমোতাবেক ইমপোর্টকারীর উপর বর্তাবে।

এগ্রিমেন্ট টু সেল পূর্ণ না করা

রপ্তানিপ্রক্রিয়ার তৃতীয় আলোচ্য বিষয় হলো কেউ এগ্রিমেন্ট টু সেল পূর্ণ না করলে শরিয়তের দৃষ্টিতে করণীয় নির্ধারণ। যদি এক্সপোর্টকারী ও ইমপোর্টকারীর মধ্যে এগ্রিমেন্ট টু সেল তথা বিক্রয়ের অঙ্গীকার হয়, প্রকৃত বিক্রয়চুক্তি সংঘটিত না হয়– এই অবস্থায় এক্সপোর্টকারী যদি বিক্রয়ের এ অঙ্গীকার পূর্ণ না করে এবং বিক্রি করতে অস্বীকার করে তখন ইমপোর্টকারী আদালতের শরণাপন্ন হতে পারবে কি না? অনুরূপ এক্সপোর্টকারী তো অঙ্গীকার পূর্ণ করল, কিন্তু ইমপোর্টকারী উক্ত পণ্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। সে কৃত-অঙ্গীকার ভঙ্গ করল। এই অবস্থায় এক্সপোর্টকারী তার বিরুদ্ধে আইনগত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে কি না?

প্রচলিত আইন একথা বলে যে, কেউ যদি এগ্রিমেন্ট টু সেল পূর্ণ না করে আর একারণে প্রতিপক্ষের কোনো ক্ষতি হয় তা হলে উক্ত পক্ষ ক্ষতিপূরণের দাবি করতে পারে। ওই পক্ষ ক্ষতিপূরণ আদায় না করলে আদালতে মামলা দায়ের করে সেই ক্ষতিপূরণ উসুল করতে পারবে। কিন্তু শরিয়তের দৃষ্টিতে এগ্রিমেন্ট

কু গেল যেহেতু একটি ওয়াদা আর ওয়াদা পূর্ণ করা শরিয়তের দৃষ্টিতে জরুরি বটে; অনুরূপ চারিত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকেও আবশ্যক। অঙ্গীকারকারীর উচিত, সে নিজের অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি নিজের অঙ্গীকার পূর্ণ না করে, তার ব্যাপারে শরিয়তের ফায়সালা হলো সে গুনাহগার তো সাব্যস্ত হবে কিন্তু দুনিয়াতে তার থেকে কোনো অর্থসম্পদ দাবি করা যাবে না এবং কোনো অর্থ উসুলের জন্য তার উপর চাপও প্রয়োগ করা যাবে না।

এর দৃষ্টান্ত হলো বিবাহোত্তর অ্যানগেজমেন্ট। এই অ্যানগেজমেন্ট ভবিষ্যতে অনুষ্ঠেয় বিবাহের অঙ্গীকার। প্রকৃত বিবাহ নয়। প্রকৃত বিবাহ ভিন্ন জিনিস। এখন যদি কেউ বিবাহের অ্যানগেজমেন্ট তো করল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে কোনো ওজর ছাড়াই বিবাহ করতে অস্বীকৃতি জানালো, তা হলে সে গুনাহগার হবে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গের অপরাধে অভিযুক্ত হবে। চারিত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকেও অনেক মন্দ কাজ করল। সামাজিকভাবেও তাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হবে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা ঠুকে দেওয়া যাবে না যে, সে বিবাহের অঙ্গীকার করেছিল, এখন সে তার অঙ্গীকার পূর্ণ করছে না। অতএব, আদালতের মাধ্যমে তাকে অঙ্গীকার পূর্ণ করতে এবং বিবাহ করতে বাধ্য করা যাবে না। আদালতে এমন মোকাদ্দমা দায়ের করা যাবে না। সুতরাং বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, স্বাভাবিক অবস্থায় আদালতের মাধ্যমে জবরদস্তিমূলক কোনো ওয়াদা পূর্ণ করানো যাবে না।

তবে বর্তমান ব্যবসাবাণিজ্যে অঙ্গীকারের গুরুত্ব অত্যধিক। ব্যবসায়ীগণ অপরপক্ষের অঙ্গীকারের উপর ভিত্তি করে এমন অনেক পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন, যাতে যথেষ্ট পরিমাণ টাকাপয়সাও ব্যয় হয় এবং তা বেশ শ্রমসাধ্য। এখন যদি অঙ্গীকারকারী বলে, আমি এই অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করব না, তা হলে অপর পক্ষের বিশাল ক্ষতি হয়ে যাবে, এজন্য কতিপয় ফকিহ আদালতের মাধ্যমে জোরপূর্বক উক্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করার বৈধতার ফতোয়া দিয়েছেন। আদালত তাকে দুই বিষয়ে চাপ প্রয়োগ করবে।

এক.

হয়তো সে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে; যেমন : পণ্য বিক্রয়ের অঙ্গীকার করলে আদালত তাকে বিক্রি করতে বাধ্য করবে, আর পণ্য ক্রয়ের অঙ্গীকার করে থাকলে পণ্য ক্রয় করতে বাধ্য করবে।

দুই.
যদি কোনো কারণে কৃতঅঙ্গীকার পূর্ণ করতে সক্ষম না হয় তা হলে উক্ত ব্যক্তি থেকে ক্ষতিপূরণ (Damage) উসুলের বৈধতার ফতোয়াও কোনো কোনো ফকিহ দিয়েছেন।

অঙ্গীকার ভঙ্গের ক্ষতির বিবরণ

তবে বর্তমান ব্যবসায়ীসমাজে ক্ষতির (Damage) যে ধারণা চালু আছে, আর শরিয়তের দৃষ্টিতে যাকে ক্ষতি বলা হয়, যে ক্ষতিপূরণ উসুলের ফতোয়া ফকিহগণ দিয়েছেন, এই দুইয়ের মাঝে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। আদালতের আইনমোতাবেক যে ক্ষতিপূরণ (Damage) উসুলের অনুমোদন দেওয়া হয়, তার ভিত্তি হলো অপারচুনিটি কস্ট, অর্থাৎ সম্ভাব্য লাভের উপর। উদাহরণস্বরূপ আমি এক ব্যক্তির সাথে ওয়াদাবদ্ধ হলাম যে, আমি তোমার নিকট এই মাল বিক্রি করব। সে ওয়াদাবদ্ধ হলো যে, এ মাল ক্রয় করবে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সে এই মাল ক্রয় করতে অস্বীকৃতি জানাল। তো এক্ষেত্রে আমি দেখবো, সে আমার থেকে উক্ত মাল ক্রয় করলে আমার কত মুনাফা হত আর সে ক্রয় না করার কারণে আমার কী পরিমাণ ক্ষতি হলো। কেননা এ মাল তৃতীয় কোনো ব্যক্তির নিকট বিক্রি করলে কম দামে বিক্রি করতে হবে।

তো মূল্যমানের এই তারতম্যকে ব্যবসায়ীদের পরিভাষায় লোকসান বলা হয়, অর্থাৎ পূর্ব নির্ধারিত মূল্য হতে যে পরিমাণ কমে বিক্রি করা হবে সে পরিমাণ লোকসান বলা হবে। আইনের পরিভাষায় এই লোকসান উসুলের জন্য আমি আদালতের শরণাপন্ন হতে পারব। অনুরূপ কোনো ব্যক্তি আমার নিকট কোনো পণ্য বিক্রি করবে বলে অঙ্গীকার করল, তার এই অঙ্গীকারের উপর নির্ভর করে আমি এক মাস পর্যন্ত আমার টাকা অন্য কাজে বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকলাম। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সে উক্ত পণ্য আমার কাছে বিক্রি করতে অস্বীকার করল। ফলে আমার লোকসান হলো। কেননা আমার এই অর্থ যদি আমি অন্যকোনো লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করতাম, তা হলে আমার এই পরিমাণ লাভ হতো, কিন্তু সে যেহেতু আমার সাথে বিক্রয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, আর এই প্রতিশ্রুতির কারণেই আমি এ অর্থ (ইন্টারেস্ট বেয়ার স্কিমে) কোনো লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করিনি। একারণে আমি উক্ত মাসের লাভ হতে বঞ্চিত হলাম। তো এই ক্ষতির কারণে আমি

আদালতে ক্ষতিপূরণের দাবি উত্থাপন করতে পারব। এধরনের সম্ভাব্য লাভ হতে বঞ্চিত হওয়ার ক্ষতিকে অপারচুনিটি কস্ট বলে। এই অপারচুনিটি কস্টের ভিত্তিতে লোকসানের হিসাবনিকাশ করা হয়।

শরিয়তের দৃষ্টিতে লোকসানের বিবরণ

শরিয়তের দৃষ্টিতে এধরনের ক্ষতি-লোকসানের কোনো ভিত্তি নেই। শরিয়তের দৃষ্টিতে লাভ না হওয়া আর লোকসান হওয়ার মাঝে পার্থক্য আছে। লাভ না হওয়া ভিন্ন বিষয় আর লোকসান হওয়া ভিন্ন বিষয়। শরিয়তের দৃষ্টিতে ক্ষতি বা লোকসানের অর্থ হলো, আমার কোনো অর্থ বাস্তবিক ব্যয় হয়ে যাওয়া, আমার অর্জিত সম্পদের বাস্তবিক কোনো ক্ষতি হওয়া। আর লাভ না হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আমি কোনো লেনদেনের আশা করেছিলাম যে, আমার এত লাভ হবে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এ পরিমাণ হয়নি; বর্তমানে ব্যবসায়ীদের পরিভাষায় লাভ না হওয়াকে যে লোকসান বলা হয়, শরিয়তের আলোকে এই ক্ষতি ও লোকসানের কোনো ভিত্তি নেই।

উদাহরণত আপনি কোনো দ্রব্য দশ টাকায় ক্রয় করলেন। আপনি আশা করছেন দ্রব্যটি ১৫ টাকায় বিক্রি করে ৫ টাকা লাভ করবেন। কিন্তু এক ক্রেতা এসে উক্ত জিনিস ১৫ টাকায় না কিনে ১২ টাকায় ক্রয় করে নিল। তো ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যবসায়িক পরিভাষায় এতে ৩ টাকার লোকসান হয়েছে বলা হবে। কিন্তু শরিয়তের দৃষ্টিতে একে কোনোক্রমেই লোকসান বলা হবে না। শরিয়তের আলোকে লোকসান তখন বলা হবে, যদি উক্ত পণ্য ৯ টাকায় বিক্রি করা হয়।

অতএব, বর্তমানের পরিভাষায় অপারচুনিটি কস্ট বা সম্ভাব্য লাভের ভিত্তিতে লোকসানের পরিসংখ্যান চালানোর সুযোগ শরিয়তের দৃষ্টিতে নেই। অঙ্গীকার সম্পর্কে এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তুলে ধরার প্রয়োজন ছিল।

রপ্তানি কাজে পুঁজি সংগ্রহকরণ

রপ্তানি কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো ডকুমেন্ট ক্রেডিট। সমাজের সর্বজনবিদিত নীতি হলো 'মানুষ চাদর দেখে পা বাড়াবে' অর্থাৎ সামর্থ্য অনুযায়ী অগ্রসর হবে। সামর্থ্যের বাইরে কদম রাখবে না। সামাজিক নীতির পাশাপাশি শরিয়তও আমাদেরকে এই নীতি শিক্ষা দেয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে মানুষ এই নীতির বিপরীত পথ অবলম্বন করে বসেছে। বর্তমানে

আমাদের নীতি হলো, প্রথমে কদম বাড়াও তারপর চাদর তালাশ করো, অর্থাৎ প্রথমে কাজের প্রতি অগ্রসর হও, তারপর সামর্থ্য আছে কিনা যাচাই করো। রপ্তানি কার্যক্রমেও মানুষ এই নীতি অবলম্বন করে থাকে। প্রথমে রপ্তানির অর্ডার গ্রহণ করে। তখন তার নিকট অর্ডারকৃত মালও থাকে না এবং তা সংগ্রহ করার পুঁজিও থাকে না। তো যদিও সামাজিক ও চারিত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই পদ্ধতি পছন্দসই নয়, তবু প্রচলিত পদ্ধতির শরয়ী বিধান আলোচনা করা হচ্ছে।

রপ্তানিকারকের পণ্য ক্রয় করার জন্য অর্থের প্রয়োজন, সে কোনো ব্যাংক বা অন্যকোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শরণাপন্ন হয়ে অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। এই অর্থ দ্বারা সে অর্ডারকৃত পণ্য প্রস্তুত করে আমদানিকারককে সরবরাহ করে। বর্তমান পরিভাষায় একে এক্সপোর্ট ফাইন্যান্সিং বলে।

সমগ্র বিশ্বে প্রচলিত নিয়মমোতাবেক ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান এ কাজের জন্য সুদভিত্তিক পুঁজি সরবরাহ করে থাকে। ইন্টারেস্ট বা সুদই হলো এই অর্থায়নের ভিত্তি। এখন প্রশ্ন হলো, কোনো মুসলমান যদি এ রপ্তানি কাজের জন্য সুদবিহীন অর্থায়ন চায়, তা হলে এর পদ্ধতি কী হবে? অন্যকথায় যদি আমরা ইসলামি শরিয়াহমোতাবেক অর্থব্যবস্থা পরিচালনা করতে চাই, তা হলে সে অর্থব্যবস্থায় এক্সপোর্ট ফাইন্যাসিং-এর কর্মপন্থা কীরূপ হবে?

এক্সপোর্ট ফাইন্যান্সিং-এর পন্থা

এক্সপোর্ট ফাইন্যান্সিং-এর দুটি পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে।

এক. প্রি-শিপমেন্ট ফাইন্যান্সিং।

দুই. পোস্ট-শিপমেন্ট ফাইন্যান্সিং।

প্রি-শিপমেন্ট ফাইন্যান্সিংয়ের ইসলামি পদ্ধতি

প্রি-শিপমেন্ট ফাইন্যান্সিং তথা পণ্য শিপমেন্টপূর্ব অর্থায়নের পদ্ধতি একেবারে সহজ। কেননা রপ্তানিকারক সাধারণত এমন অবস্থায় পণ্য রপ্তানির অর্ডার গ্রহণ করে থাকে, যখন পণ্য সাপ্লাইয়ের অর্থ তার নিকট মজুদ থাকে না। অর্ডার পেয়ে প্রথমে সে পুঁজি সংগ্রহের চেষ্টা করে। এখন যদি সে কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে সুদবিহীনপন্থায় পুঁজি সংগ্রহ করতে চায়, তা হলে এর সহজ পথ হলো মুশারাকাপদ্ধতি অবলম্বন করা। কেননা এক্সপোর্টকারীর নিকট পণ্যের সুনির্দিষ্ট অর্ডার রয়েছে, যাতে পণ্যমূল্য

নির্ধারিত আছে। কি পরিমাণ পণ্য কত মূল্যে সরবরাহ করা হবে, তা জানা আছে। আর সেই মূল্য হিসাবে এলসি খোলা হয়েছে। তা ছাড়া এটাও জানা আছে যে, এই পণ্য সরবরাহ করা হলে কত লাভ হবে। ব্যয় কত হবে তাও মোটামুটি জানা। কেননা ব্যয়ের ভিত্তিতেই দরদাম নির্ধারণ করা হয়েছে। যেহেতু ব্যয় মোটামুটি জানা, লাভের পরিমাণও জানা, তা হলে যেকোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান খুব সহজেই এ রপ্তানি কাজে এক্সপোর্টকারীর সঙ্গে মুশারাকাচুক্তি করতে পারে। এই অবস্থায় ব্যাংক রপ্তানিকারককে বলবে, আমরা পুঁজি সরবরাহ করব, আপনি অর্ডার মোতাবেক মাল প্রস্তুত করে রপ্তানি করবেন। আমদানিকারক থেকে পণ্যমূল্য আসার পর যা লাভ হবে, তা আমরা পরস্পরে নির্দিষ্ট হারে (যে হার নির্ধারণ মুশারাকাচুক্তির সময়ই করা হবে) বণ্টন করে নেব। এভাবে খুব সহজেই সুদবিহীন অর্থায়ন হতে পারে।

অবশ্য মুশারাকাপদ্ধতি বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য জরুরি হলো, রপ্তানিকারকের পক্ষ থেকে স্বল্প হলেও পুঁজি লাগানো। কেননা মুশারাকা এমন যৌথ কারবার, যাতে উভয়পক্ষের পুঁজি থাকে। যদি রপ্তানিকারক এ রপ্তানি-কার্যক্রমে কোনো পুঁজি না খাটায়, বরং সম্পূর্ণ পুঁজি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে নিতে চায়, তা হলে মুদারাবাচুক্তি করতে পারে। কেননা মুদারাবাব্যবসায় একপক্ষের শ্রম থাকে অপরপক্ষের পুঁজি থাকে। তবে সাধারণত রপ্তানিকারক অল্প হলেও পুঁজি খাটিয়ে থাকে। এজন্য শরিয়তের দৃষ্টিতে তা মুশারাকাচুক্তি হবে। লাভের হার পারস্পরিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নির্ধারণ করে নেবে। সারকথা প্রি-শিপমেন্ট ফাইন্যান্সিংয়ে সহজেই মুশারাকাপদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে।

পোস্ট-শিপমেন্ট ফাইন্যান্সিংয়ের ইসলামি পদ্ধতি

রপ্তানি-বাণিজ্যে অর্থায়নের দ্বিতীয় পদ্ধতি পোস্ট-শিপমেন্ট ফাইন্যান্সিং, অর্থাৎ পণ্য জাহাজিকরণ পরবর্তী অর্থায়ন। এর সারকথা হলো, রপ্তানিকারক অর্ডারকৃত মাল আমদানিকারক বরাবর পাঠিয়ে দিয়েছে। এখন তার নিকট উক্ত মালের বিল রয়েছে। তবে এ বিলের মেয়াদপূর্তিতে আরও সময় বাকি আছে। কিন্তু রপ্তানিকারকের তাৎক্ষণিক টাকার প্রয়োজন। এজন্য সে বিল নিয়ে ব্যাংকের শরণাপন্ন হয় এবং বলে, সময় পূর্ণ হয়ে গেলে এ বিল দেখিয়ে আমদানিকারক থেকে আপনি টাকা উসুল করে নেবেন। এখন এ বিল জমা রেখে আমাকে টাকা দিন। ব্যাংক এ বিলের মূল্য কিছুটা হ্রাস করে বাকি টাকা এক্সপোর্টকারীকে দিয়ে দেয়, যাকে বর্তমানে বিল ডিসকাউন্টিং বলে। যেমন :

এক লক্ষ টাকার বিল। ব্যাংক ১০% ডিসকাউন্ট করে অবশিষ্ট ৯০ হাজার টাকা রপ্তানিকারককে দিয়ে দেবে। পরবর্তী সময়ে আমদানিকারক থেকে এক লক্ষ টাকা উসুল করে নেবে। বিল ডিসকাউন্টিং-এর এই পদ্ধতি শরিয়তসম্মত নয়; বরং তা নাজায়েয। এটি সুদি লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত।

বিল ডিসকাউন্টিং-এর শরিয়তসম্মত পদ্ধতি

বিল ডিসকাউন্টিং-এর শরিয়তসম্মত বিকল্প ব্যবস্থা দুইভাবে হতে পারে। প্রথম পদ্ধতি হলো, যে ব্যক্তি পণ্য জাহাজিকরণ-পরবর্তী অর্থায়নে আগ্রহী সে পণ্য প্রেরণের পূর্বেই ব্যাংকের সাথে মুশারাকাচুক্তি করবে। যার বিস্তারিত বিবরণ আমরা প্রি-শিপমেন্ট ফাইন্যান্সিং পদ্ধতিতে আলোচনা করেছি। আর দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো রপ্তানিকারক আমদানিকারকের নিকট পণ্য পাঠাবার পূর্বে উক্ত পণ্য এলসিতে উল্লেখকৃত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে ব্যাংকের নিকট বিক্রি করে দেবে। তারপর ব্যাংক সেই মূল্যে উক্ত পণ্য আমদানিকারকের নিকট বিক্রি করবে, উভয় মূল্যের পার্থক্য ব্যাংকের লাভ সাব্যস্ত হবে। যেমন : এক লক্ষ টাকার এলসি খোলা হলো, তা হলে রপ্তানিকারক উক্ত পণ্য ব্যাংকের নিকট ৯৫ হাজার টাকায় বিক্রি করে দেবে। পরবর্তী সময়ে ব্যাংক আমদানিকারকের নিকট তা এক লক্ষ টাকায় বিক্রি করবে। এতে করে পাঁচ হাজার টাকা ব্যাংকের লাভ হবে।

তবে এ দ্বিতীয় পদ্ধতিটি তখনই সম্ভব হবে, যদি আমদানিকারকের সাথে প্রকৃত বিক্রয়চুক্তি সংঘটিত না হয় বরং বিষয়টি এগ্রিমেন্ট টু সেলের পর্যায়ে থাকে। পক্ষান্তরে যদি প্রকৃত বিক্রয়চুক্তি হয়ে যায়, তা হলে এ পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে না।

এই দ্বিতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করেও রপ্তানিকারক নগদ অর্থের ব্যবস্থা করতে পারে। তাকে তার ব্যয় করা অর্থের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। তবে বিল ডিসকাউন্টিং-এর যে পদ্ধতি বর্তমানে ব্যাংকিংখাতে প্রচলিত আছে, তা কোনোক্রমেই শরিয়তসম্মত নয়।

বিল ডিসকাউন্টিংয়ে আরেকটি পদ্ধতির কথাও কোনো কোনো মহল থেকে বলা হয়। সেই পদ্ধতিটি কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে আমলযোগ্য হতে পারে। কিন্তু সাধারণত সেসব শর্ত পূর্ণ করা হয় না। একারণে এ পদ্ধতি অবলম্বনের অনুমতি দেওয়া হয় না। তবে কেউ সকল শর্ত পূর্ণ করে এ পদ্ধতি অবলম্বন

করতে চাইলে তা নাজায়েয হবে না। সে পদ্ধতিটি হলো, যে ব্যক্তি বিল ডিসকাউন্টিং করতে চায়, সে ব্যাংকের সাথে দুটি পৃথক চুক্তি করবে।

এক. রপ্তানিকারক ব্যাংককে আমদানিকারক থেকে পণ্যমূল্য উসুল করার জন্য উকিল (প্রতিনিধি) বানাবে। ব্যাংক তার পক্ষ থেকে এজেন্ট হিসাবে আমদানিকারক থেকে পণ্যমূল্য উসুল করবে। এবং এ কাজ আন্জাম দেওয়ার কারণে রপ্তানিকারক থেকে সার্ভিসচার্জ (পারিশ্রমিক) নেবে।

দুই. দ্বিতীয়ত ব্যাংক এলসি মূল্য থেকে কিছু কম অর্থ রপ্তানিকারককে সুদবিহীন করযে হাসানা দেবে।

উদাহরণস্বরূপ, রপ্তানিকারক যে বিলটির ডিসকাউন্টিং করতে চাচ্ছে, সে বিলটি এক লক্ষ টাকার। এখন রপ্তানিকারক প্রথমে ব্যাংককে নিজের এজেন্ট তথা প্রতিনিধি বানাবে। আপনি আমদানিকারক থেকে এ টাকা উসুল করে আমাকে সরবরাহ করুন। আমি আপনাকে ৫ হাজার টাকা সার্ভিসচার্জ অর্থাৎ পারিশ্রমিক দিব। দ্বিতীয় চুক্তি হলো, রপ্তানিকারক ব্যাংক হতে ৯৫ হাজার টাকা করযে হাসানা নেবে। সে ব্যাংককে বলবে, আমদানিকারক থেকে আমার এ বিলের অর্থ উসুল করে ৯৫ হাজার টাকা তুমি ঋণ পরিশোধ বাবদ নিয়ে নেবে, আর পারিশ্রমিক হিসাবে অবশিষ্ট ৫ হাজার টাকা গ্রহণ করবে। এভাবে লেনদেনের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

এই প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ সম্ভব। তবে এতে একটি শর্ত পালন অবশ্যকর্তব্য। অন্যথায় লেনদেন কোনোক্রমেই শরিয়তসম্মত হবে না। সে শর্তটি হলো সার্ভিসচার্জ তথা পারিশ্রমিকের পরিমাণ নির্ধারণের সাথে বিল মেচিউরিটির কোনো সম্পর্ক থাকতে পারবে না, অর্থাৎ সার্ভিসচার্জ বিল মেচিউরিটির প্রিয়ডের সাথে রিলেটেড হবে না।

উদাহরণস্বরূপ, এমন হবে না যে, বিল পরিশোধের সময় তিন মাস বাকি আছে। তো সার্ভিসচার্জ চার হাজার টাকা। আর যদি চার মাস বাকি থাকে তা হলে সার্ভিসচার্জ ৬ হাজার টাকা। অর্থাৎ বিল আদায়ের সময়সীমা কমবেশি হওয়ার কারণে সার্ভিসচার্জ বেশকম করা যাবে না। সকল অবস্থায় একটি সুনির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। এই শর্ত-অনুযায়ী উপর্যুক্ত পদ্ধতি শরিয়ত-সম্মত হবে (অনুরূপ করযে হাসানা দেওয়ার কারণে সার্ভিসচার্জের পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। এক্ষেত্রে সমাজে প্রচলিত পারিশ্রমিক নির্ধারণ করতে হবে। —অনুবাদক)। এক্সপোর্ট ফাইন্যান্সিং

সম্পর্কে এ ছিল কিছু কথা ও বিশ্লেষণ। এখন আমরা ফরেন এক্সচেঞ্জের অগ্রিম বুকিং সম্পর্কে আলোচনা করব।

ফরেন এক্সচেঞ্জের অগ্রিম বুকিং

এক্ষেত্রে প্রথম মাসআলা হলো, ফরেন এক্সচেঞ্জ তথা বৈদেশি মুদ্রার অগ্রিম বুকিং দেওয়া যাবে কি না, শরিয়তের নিরিখে তা পর্যালোচনা করা। এব্যাপারে প্রথমত আমরা মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয়ের কিছু মূলনীতি উল্লেখ করব। তারপর সেই মূলনীতির আলোকে এ বিষয়ের সমাধান পেশ করব।

মুদ্রা বেচাকেনার মূলনীতি

প্রথম মূলনীতি

দেশীয় মুদ্রার বিনিময় অন্য দেশীয় মুদ্রার সাথে করা যাবে। শরিয়তের দৃষ্টিতে এই লেনদেন বৈধ। পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে মুদ্রার যেকোনো মূল্য নির্ধারণ করা যাবে। তবে যেসব দেশে ভিন্ন দেশীয় মুদ্রার মূল্য সরকারিভাবে নির্ধারণ করে দেওয়া আছে, আর উক্ত মূল্য থেকে কম বেশি করে মুদ্রার কেনাবেচা আইনগতভাবে নিষিদ্ধ, সেসব দেশে সরকারি আইনবিরোধী হওয়ার কারণে সরকারকর্তৃক নির্ধারিত মূল্য থেকে বেশকম করে মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয় শরিয়তের দৃষ্টিতেও নিষিদ্ধ। কেননা বিশেষ কোনো কারণ ছাড়া সরকারি আইনের বিরুদ্ধাচরণ করা শরিয়তের দৃষ্টিতেও বৈধ নয়। তবে একথা স্পষ্ট যে, এটি সুদি লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত নয়। এতে সুদের কোনো মিশ্রণ নেই এবং অবৈধ হওয়ার বিধানও সুদের কারণে নয়। যেমন : ধরা যাক, দেশে ডলারের মূল্য ৩০ টাকা সরকারিভাবে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে এবং বেশকমের সাথে ডলারের লেনদেন আইনত নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এখন যদি দুই ব্যক্তি পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ডলারের মূল্য ৩১ টাকা নির্ধারণ করে লেনদেন করে, তা হলে একে সুদি লেনদেন বলা যাবে না। কিন্তু যেহেতু সরকার ডলারের মূল্য ৩০ টাকা নির্ধারণ করে দিয়েছে। আর যথাসাধ্য সরকারি আইনের সুরক্ষাও জরুরি। এ হিসাবে যেহেতু এ লেনদেনে সরকারি আইন লঙ্ঘিত হয়েছে এজন্য এ লেনদেনটি শরিয়তের দৃষ্টিতে মাকরুহ হবে। তবে যদি সরকারকর্তৃক খোলাবাজারে মুদ্রার লেনদেন কমবেশির সাথে করার অনুমতি থাকে যেমনটি বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে তা হলে শরিয়তের দৃষ্টিতে এই লেনদেন বৈধ সাব্যস্ত হবে।

দ্বিতীয় মূলনীতি

যখন দুই দেশীয় মুদ্রার পারস্পরিক লেনদেন করা হবে তখন বিক্রয় মজলিসে অন্তত একপক্ষের মুদ্রা হস্তগত করতে হবে। অন্যপক্ষ পরবর্তী সময়ে হস্তগত করলেও চলবে।

তৃতীয় মূলনীতি

যদি দুই দেশীয় মুদ্রার বাকি লেনদেন হয়, অর্থাৎ একপক্ষ তো বিক্রি মজলিসেই মুদ্রা হস্তান্তর করেছে, কিন্তু অপরপক্ষ মুদ্রা হস্তান্তরের জন্য ভবিষ্যতের কোনো তারিখ নির্ধারণ করেছে, তা হলে এক্ষেত্রে মুদ্রার বাজারমূল্য নির্ধারণ করা আবশ্যক। পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতেও বাজারমূল্য থেকে বেশকম করা যাবে না। যেমন : আমি আজ দেশীয় এক হাজার টাকা কাউকে দিলাম এবং তাকে বললাম, এক মাস পর আমাকে এর পরিবর্তে এত ইউএস ডলার দেবে। এই পদ্ধতিতে ডলারের যে মূল্য নির্ধারণ করা হবে, তা ডলারের মার্কেটমূল্য থেকে বেশকম হতে পারবে না। কেননা যদি মার্কেটমূল্য থেকে কমবেশ করার সুযোগ থাকে, তা হলে এর দ্বারা সুদ খাওয়ার রাস্তা খুলে যাবে। সুদখোররা এই পন্থাকে সুদ খাওয়ার হিলা বানাবে। যেমন : ডলারের বাজারমূল্য ৩০ টাকা; এ হিসাবে এক হাজার টাকায় ৩৩.৩৩ ডলার পাওয়া যাবে। কিন্তু সুদ খাওয়ার জন্য বলা হবে, একমাস পর আমাকে ৪০ ডলার দিতে হবে। (তখন ৪০ × ৩০ = ১২০০ টাকা। অর্থাৎ ১০০০ টাকা এক মাসের জন্য দিয়ে ১২০০ টাকা উসুল করা হবে। এমন লেনদেন শরিয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ। কেননা এভাবে তখন মানুষ সহজে সুদ খাবে এবং সুদের রাস্তা খুলে যাবে। এজন্য দুইদেশীয় মুদ্রার বাকি বিক্রিতে বাজারমূল্য আবশ্যক।

উল্লেখিত তিনটি মূলনীতি বা শর্তের উপস্থিতি তখনই আবশ্যক, যখন কারেন্সির প্রকৃত বিক্রয়চুক্তি হবে। আর যদি প্রকৃত সেল না হয়, বরং এগ্রিমেন্ট টু সেল বা ভবিষ্যতবিক্রয়ের ওয়াদা হয়, অর্থাৎ উভয়পক্ষ পরস্পর ওয়াদাবদ্ধ হয় যে, আগামী অমুক তারিখে আমরা দেশীয় মুদ্রা ও ডলারের লেনদেন করব। ওয়াদাবদ্ধ হওয়ার সময় দেশীয় মুদ্রা দেওয়া হয়নি। ডলারও দেওয়া হয়নি। এক্ষেত্রে উল্লেখিত শর্তাবলি আবশ্যক হবে না। কিন্তু বিষয়টি ওয়াদার পর্যায়েই থাকতে হবে। সারকথা, ওয়াদার পর্যায়ে থাকলে মজলিসের মধ্যেই অন্তত এক দিকের কারেন্সি দখলে নেওয়া, মার্কেটমূল্য অনুযায়ী

হওয়া– কোনোটি আবশ্যক নয়। বেশকমেরও ওয়াদা করা যাবে। কিন্তু প্রকৃত বিক্রি হয়ে একপক্ষের মুদ্রা হস্তান্তর করা হলে বাজারমূল্য আবশ্যক, বেশকম করে বিক্রি করা যাবে না।

অতএব যদি আমি অন্য পার্টির সাথে এভাবে চুক্তি করি যে, আগামী অমুক তারিখে এত টাকার বিনিময়ে এত ডলার ক্রয় করব, তা হলে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে যেকোনো রেট নির্ধারণের অবকাশ শরিয়তে রয়েছে। কেননা এটি বিক্রি নয়, বরং বিক্রির অঙ্গীকারমাত্র। তবে একথা বাস্তব যে, ওয়াদার কারণে একপক্ষ অপরপক্ষ থেকে কোনো ফি দাবি করতে পারবে না। যেমন : কোনো পক্ষ একথা বলতে পারবে না যে, আমি যেহেতু তোমার সাথে ওয়াদাবদ্ধ হলাম, আগামী অমুক তারিখে এই রেটে তোমাকে ডলার সরবরাহ করব; সুতরাং এই ওয়াদার কারণে আমি তোমার থেকে এই পরিমাণ ফি উসুল করব। উক্ত তারিখ এলে, তুমি আমার থেকে ডলার ক্রয় করো বা না করো, ফি তোমাকে দিতে হবে। তো এভাবে ফরেন এক্সচেঞ্জের বুকিং বা অঙ্গীকারের উপর ফি উত্তোলন শরিয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ। এই হলো মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের কতিপয় মূলনীতি, যেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হলো।

ফরেন এক্সচেঞ্জ বুকিং ফি

এখন আমরা মূল বিষয়ে ফিরে আসছি। আমাদের দেশে ফরেন এক্সচেঞ্জ বুকিং-এর বিভিন্ন পদ্ধতি চালু আছে। অনেকসময় এমনও হয় যে, ব্যাংক ফরেন এক্সচেঞ্জ বুকিংয়ের উপর গ্রাহক থেকে ফি উসুল করে থাকে। কথা হলো যদি কেউ ফরেন এক্সচেঞ্জের বুকিংয়ের উপর এরূপ ফি গ্রহণ করে, তা হলে শরিয়তের দৃষ্টিতে এই লেনদেন নাজায়েয হবে। তবে হ্যাঁ, কেউ পৃথকভাবে বুকিং ফি গ্রহণ না করে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ডলারের দাম বাড়িয়ে নির্ধারণ করল তা হলে এতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা বুকিংয়ের অর্থ হলো ওয়াদাবদ্ধ হওয়া, আর ওয়াদার পর্যায়ে মার্কেট রেট আবশ্যক নয়। তবে শর্ত হলো, এতে অন্য ফাসেদ শর্তের মিশ্রণ না থাকতে হবে।

এখন প্রশ্ন হলো, আমাদের দেশে (পাকিস্তানে) ফরেন এক্সচেঞ্জ বুকিং ফি নেওয়া হয় কি না? এব্যাপারে আমার সঠিক তথ্য জানা নেই। অবশ্য আমি শরিয়তের বিধান বর্ণনা করে দিয়েছি যে, যদি বুকিং ফি নেওয়া হয়, তা হলে তা অবৈধ। আর ফি নেওয়া না হলে বুকিং বৈধ।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, বুকিং দেওয়ার পর যদি নির্দিষ্ট তারিখে গ্রাহক কারেন্সি লেনদেন না করল, তা হলে ব্যাংক কী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে? যেমন : আমি তিনদিন পরেরতারিখে ফরেন কারেন্সি নেওয়ার জন্য বুকিং দিয়েছি; কিন্তু সে নির্দিষ্ট তারিখ আসার পরও আমি ব্যাংক থেকে ফরেন কারেন্সি নিলাম না, তা হলে ব্যাংকের পক্ষ থেকে আমার উপর কোনো জরিমানা আরোপ হবে কি না? এ ব্যাপারেও আমার নিকট সঠিক কোনো তথ্য নেই।

তা ছাড়া প্রাপ্ততথ্য অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক ভিন্ন ভিন্ন প্রিয়ডের (সময়ের) জন্য ভিন্ন ভিন্ন রেট দিয়ে থাকে। অন্যান্য ব্যাংক সে আলোকেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে এগ্রিমেন্ট টু সেল করে থাকে এবং পরবর্তী সময়ে প্রকৃত সেল করে। এখন যদি কোনো গ্রাহক ব্যাংকের শরণাপন্ন হয়ে তিন মাসের প্রিয়ডে ফরেন এক্সচেঞ্জ বুকিং দিতে চায়, তা হলে উক্ত ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকপ্রদত্ত রেটের আলোকে বুকিং গ্রহণ করবে। পরবর্তী সময়ে যদি এ গ্রাহক স্বীয় বুকিং প্রত্যাহার করতে চায়, তখন ব্যাংক দেখবে বর্তমান মার্কেট রেট কত? সে রেটের আলোকে বিবেচনা করবে যে, এ প্রত্যাহারে ব্যাংকের লাভ না লোকসান। যদি ব্যাংকের লাভ সাব্যস্ত হয়, তা হলে বিনাবাক্যে ব্যাংক উক্ত বুকিং প্রত্যাহার করে নেবে কিন্তু যদি এ প্রত্যাহারের ফলে ব্যাংকের ক্ষতি হয়, পার্টির লাভ হয়, তা হলে ব্যাংক গ্রাহককে বলে বুকিং প্রত্যাহার করলে ব্যাংকের ক্ষতি হবে। ব্যাংককে এত টাকার লোকসান গুনতে হবে, তাই এই টাকা আপনার পরিশোধ করতে হবে। অবশ্য বুকিংকালে কোনো ফি নেওয়া হয় না।

রপ্তানিপ্রক্রিয়ায় জরুরি বিষয়গুলোর শরয়ীবিধান আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। আল্লাহ তায়ালা আমাদের এসব বিধান পালন করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

প্রশ্নোত্তর পর্ব

ভাষণ শেষে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে কিছু প্রশ্ন করা হয়। হযরত সেসব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিয়েছিলেন। নিম্নে তা প্রদত্ত হল।

একজনের সাথে বিক্রয়ে ওয়াদা করে অন্যজনের সাথে বিক্রয়চুক্তি করা

প্রশ্ন : (এক)

মুহতারাম, আপনি যেমনটি আলোচনা করেছেন, যদি কেউ শরিয়ত-সম্মতভাবে পোস্ট-শিপমেন্ট ফাইন্যান্সিং করতে চায়, তা হলে এর একটি পদ্ধতি হলো, যখন এক্সপোর্টকারী অর্ডার পাবে তখন সে ইমপোর্টকারীর সাথে এগ্রিমেন্ট টু সেল করবে। তারপর এক্সপোর্টকারী ব্যাংক বা অন্যকোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট এলসিতে ধার্যকৃত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে সে পণ্য বিক্রি করে দেবে। তারপর ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এলসিতে উল্লেখিত মূল্যে সেই পণ্য সরাসরি আমদানিকারকের নিকট বিক্রি করবে। তো এটা কি শরিয়তবিরোধী হয়ে গেল না? একদিকে সে আমদানিকারকের সাথে এগ্রিমেন্ট টু সেল করল। আবার উক্ত পণ্যই সে ব্যাংকের নিকট বিক্রি করে দিল।

উত্তর : আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, আমদানিকারকের সাথে এখনও প্রকৃত বিক্রি সংঘটিত হয়নি। শুধু বিক্রির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এদিকে রপ্তানিকারকের জরুরি ভিত্তিতে টাকার প্রয়োজন। এজন্য সে ব্যাংকের শরণাপন্ন হয়ে বলবে, আমি সরাসরি আমদানিকারকের নিকট এ পণ্য বিক্রি না করে আপনি আমার থেকে এ পণ্য নগদে ক্রয় করে নিন এবং আমদানি-কারকের নিকট বিক্রি করুন। আমদানিকারকের সাথে প্রকৃত বিক্রি তো সংঘটিত হয়নি। হয়েছে কেবল বিক্রির অঙ্গীকার। এদিকে আমদানিকারকের পণ্যের প্রয়োজন। কে এই পণ্যসরবরাহ করছে তা বিবেচ্য বিষয় নয়। এ কারণে এক্সপোর্টকারী নিজের এগ্রিমেন্ট টু সেল ব্যাংকের নিকট হস্তান্তর

করবে। এতে আমদানিকারকের কোনো ক্ষতি নেই। এজন্য শরিয়তের দৃষ্টিতে এতে কোনো সমস্যা নেই।

এটাও হতে পারে যে, ব্যাংক আমদানিকারককে বলবে, পূর্ব এগ্রিমেন্ট টু সেল বাতিল করা হলো। এখন নতুনভাবে আমার সাথে সেলচুক্তি করুন। তারপর সেই সেলের ভিত্তিতে ব্যাংক আমদানিকারক বরাবর মাল পাঠাবে। এতেও শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো সমস্যা নেই।

রিবেট (শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ) এর হকদার কে হবে?

প্রশ্ন : (দুই)

কোনো রপ্তানিকারক বিদেশে পণ্য প্রেরণের অর্ডার পেলো। এখন সে এই অর্ডার ব্যাংককে ট্রান্সফার করে দিল এবং বলল, আমদানিকারকের নিকট পণ্য তুমি বিক্রি করো, যার বিবরণ প্রথম প্রশ্নে উল্লেখ হয়েছে। এখন বিষয় হলো, ব্যাংক তো সাধারণত সরাসরি নিজে কোনো রপ্তানি কার্যক্রমে জড়িত হয় না। (অনেক দেশে ব্যাংকের সরাসরি এসব কাজে জড়িত হওয়ার আইনত অনুমতি নেই) বরং ব্যাংক সাধারণত এজেন্ট বা প্রতিনিধির মাধ্যমেই কাজ করিয়ে থাকে। আর এধরনের লেনদেনে ব্যাংক এক্সপোর্টকারীকেই এজেন্ট বানাবে আর বলবে, তুমিই আমার পক্ষ থেকে আমদানিকারকের নিকট পণ্য প্রেরণ করো। তারপর এক্সপোর্টকারীই ব্যাংকের পক্ষ থেকে পণ্য প্রেরণ করেছে। প্রশ্ন হলো এই অবস্থায় সরকারের পক্ষ হতে প্রদত্ত শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ (রিবেট) এর হকদার কে হবে? ব্যাংক না এক্সপোর্টকারী।

উত্তর :

মূলত এখানে দুইটি বিষয় ভিন্ন ভিন্ন।

এক. হুবহু অর্ডারকে ব্যাংকের নিকট ট্রান্সফার করে দেওয়া। এ ছাড়া ব্যাংকের সাথে অন্যকোনো চুক্তি না হওয়া।

দুই. ব্যাংকের নিকট রপ্তানিযোগ্য পণ্য বিক্রি করে দেওয়া। শুধু অর্ডার ট্রান্সফার শরিয়তের দৃষ্টিতে শুদ্ধ নয়। তবে হ্যাঁ, এটা হতে পারে যে, রপ্তানিকারক প্রথমে উক্ত পণ্য ব্যাংকের নিকট বিক্রি করবে, তারপর ব্যাংক উক্ত মাল নিজে আমদানিকারকের নিকট বিক্রি করবে। এই অবস্থায় যেহেতু ব্যাংক বিক্রেতা এই কারণে বিক্রেতা হিসাবে সব দায়িত্ব ব্যাংকের উপরই বর্তাবে। কোনো ওয়ারেন্টি বা বিক্রয়োত্তর সেবার প্রতিশ্রুতি থাকলে তা

ব্যাংকেরই দায়িত্ব হবে। এই ওয়ারেন্টি দাবিও ব্যাংকের উপরই উত্থাপিত হবে।

এখন সরকারের পক্ষ থেকে প্রাপ্য রিবেট-এর বিষয়। মূলত এ বিষয়টি সরকারের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যদি সে চায়, তা হলে এ রিবেট, যা সরকার পুরস্কার হিসাবে দিয়ে থাকে, ওই ব্যক্তিকে দিতে পারে, যে রপ্তানির অর্ডার পেয়েছে এবং মাল প্রস্তুত করেছে। কিন্তু কারণবশত সরাসরি নিজে পাঠাতে পারেনি, ব্যাংকের নিকট বিক্রি করে দিয়েছে। ফলে ব্যাংক তা আমদানিকারকের নিকট সরবরাহ করেছে। আর যদি চায় তা হলে ব্যাংককেও দিতে পারে। কেননা প্রকৃত রপ্তানিকারক এখন ব্যাংকই আর ওই ব্যক্তি ব্যাংকের প্রতিনিধি।

আমদানিকারকের সম্মতি আবশ্যক কি না?

প্রশ্ন : (তিন)

রপ্তানিকারকের সাথে কৃত অর্ডার ব্যাংকের নিকট ট্রান্সফার করা হলে এতে আমদানিকারকের সম্মতির প্রয়োজন পড়বে কি না?

উত্তর : নিঃসন্দেহে আমদানিকারকের সম্মতি আবশ্যক। অতএব, যদি আমদানিকারক এই ট্রান্সফারে সম্মত না হয়, তা হলে রপ্তানিকারক তার সাথে কৃত এগ্রিমেন্ট টু সেল বাতিল করে দিয়ে পরবর্তী সময়ে ব্যাংক আমদানিকারকের সাথে সম্পূর্ণ ভিন্ন চুক্তি করবে এবং মাল পাঠিয়ে দেবে।

সুদি ঋণগ্রহণকারীর নিকট কোনো পণ্য বিক্রি করা যাবে কি না?

প্রশ্ন : (চার)

যদি কোনো রপ্তানিকারক রপ্তানি কাজের জন্য ব্যাংক থেকে সুদভিত্তিক লোন নেয় এবং দোকানদারের নিকট গিয়ে ওই অর্থ দ্বারা মাল ক্রয় করে, তা হলে দোকানদারের জন্য স্বীয় মাল তার নিকট বিক্রি করা বৈধ হবে কী? দোকানদারেরও বিষয়টি জানা আছে, সেই সুদভিত্তিক ঋণ নিয়ে মাল ক্রয় করছে এবং রপ্তানি করছে।

উত্তর : যদি কেউ ব্যাংক থেকে সুদভিত্তিক ঋণ নেয় এবং দোকানদারও বিষয়টি জানে, তবু তার নিকট পণ্য বিক্রি করতে শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো সমস্যা নেই। এতে কোনো গুনাহ হবে না। কারণ কোনো ব্যক্তি যখন সুদি লেনদেন করে তখন সে মারাত্মক ধরনের গুনাহ করে, তা আল্লাহ এবং রাসুল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করার শামিল। তবু যে অর্থ সে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করেছে, সে অর্থ দ্বারা কোনো জিনিস ক্রয় করা নাজায়েয নয়। এই অর্থ ব্যবহার তার জন্য হালাল। সুদভিত্তিক লেনদেন করার গুনাহ তো অবশ্যই তার হবে। কিন্তু এ অর্থ ব্যবহারে তার কোনো প্রভাব পড়বে না। এজন্য এমন ব্যক্তির নিকট পণ্য বিক্রি করা যেতে পারে।

পণ্যের ডকুমেন্টস বিক্রি করা শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কী?

প্রশ্ন : (পাঁচ)

পণ্যের ডকুমেন্টস বিক্রি করা শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে কী?

উত্তর : কেবল ডকুমেন্টস বিক্রি শরিয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নেই। অবশ্য যে পণ্যের ডকুমেন্টস, সে পণ্যের বাস্তবিক বিক্রি শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ। তবে এ বিক্রির কারণে পণ্যের রিস্ক ও সকল প্রকার ঝুঁকি ক্রেতার প্রতি স্থানান্তরিত হতে হবে, অর্থাৎ সর্বপ্রকার দায়িত্বসহ পণ্য ক্রয় করলে তা জায়েয হবে। কোনো প্রকার দায়িত্ব ও ঝুঁকি গ্রহণ ছাড়া কেবল ডকুমেন্টস হস্তান্তর শরিয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ।

ব্যাংকের জন্য কি সরাসরি ব্যবসা করার অনুমতি আছে?

প্রশ্ন : (ছয়)

ব্যাংকের জন্য সরাসরি ব্যবসা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, তথা ট্রেডিংয়ের তো অনুমতি নেই; তারা কেবল ব্যবসাখাতে অর্থায়ন করতে পারে; কিন্তু আপনি রপ্তানির যে-পদ্ধতি পেশ করলেন, এক্সপোর্টকারী প্রথমে রপ্তানিযোগ্য পণ্য ব্যাংকের নিকট বিক্রি করবে। তারপর ব্যাংক আমদানিকারকের নিকট তা বিক্রি করবে। ব্যাংক আমদানিকারকের নিকট সরাসরি তা কীভাবে বিক্রি করবে?

উত্তর : আমাদের বর্তমান আইনে এই বৈপরীত্য বিদ্যমান, একদিকে তো আইন বলে ব্যাংক ব্যবসা (ট্রেডিং) করবে না, অন্যদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে অন্যান্য সাধারণ ব্যাংককে বিনিয়োগের যেসব পদ্ধতির (মুড অব ফাইন্যান্সিং) অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, তাতে ব্যবসাসংক্রান্ত পন্থার (ট্রেড রিলেটেড মুডস) উল্লেখ রয়েছে। এতে ট্রেড শব্দই স্পষ্ট উল্লেখ আছে। মুরাবাহা ব্যবসাসংক্রান্ত পদ্ধতি (ট্রেড রিলেটেড) এমনিভাবে মার্কআপও মূলত ট্রেড রিলেটেড। অতএব, একদিকে তো বলা হচ্ছে 'ট্রেড রিলেটেড মুডস'-

এর অনুমতি আছে অপরদিকে বলা হচ্ছে, ব্যাংক ট্রেডিংয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। এই বৈপরীত্য আমাদের আইনে বিদ্যমান। বিষয়টির নিষ্পত্তির জন্য কোর্টের শরণাপন্ন হওয়া দরকার। তখন কোর্ট ফায়সালা করবে, এই বৈপরীত্য কীভাবে দূর করবে? অবশ্য আমার মত হলো, ব্যাংকের (ট্রেডিং) ব্যবসার অনুমতি থাকা উচিত। এতে করে ব্যাংক ধীরে ধীরে সুদি লেনদেন হ্রাস করতে পারবে।[৪০]

এজেন্টকর্তৃক গুণগত মান নির্ণয় সার্টিফিকেট ইস্যু করা দ্বারা কি মালের দখল স্থানান্তরিত হয়ে যাবে

প্রশ্ন : (সাত)

সাধারণত ভিনদেশীয় ক্রেতাদের এজেন্ট আমাদের দেশে অবস্থান করে থাকে। তাদের কাজ হলো পণ্যসামগ্রীর তদারকি করা, গুণগত মান পর্যবেক্ষণ করা এবং মাল তৈরীর কোন্ পর্যায়ে আছে তা দেখাশোনা করা। মাল সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে গেলে এজেন্টগণ আইসি (মাননির্ণয় সার্টিফিকেট) তৈরি করে। যার অর্থ হলো মাল বিশুদ্ধ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হয়েছে। এখন এক্সপোর্ট করা যেতে পারে। এই সার্টিফিকেট জারি হওয়ার পর রপ্তানিকারক আমদানিকারক বরাবর মাল পাঠিয়ে দেয়। এখন প্রশ্ন হলো, এজেন্টকর্তৃক এই সার্টিফিকেট ইস্যু হওয়া দ্বারা মালের দায়দায়িত্ব আমদানিকারকের উপর ন্যস্ত হয়ে যাবে?

উত্তর : যদি আমদানিকারকের পক্ষ থেকে এই এজেন্টের মাল বুঝে নেওয়ার (ডেলিভারি) অধিকার ও ক্ষমতা থাকে এবং সে দখল বুঝে নেয়, তা হলে পণ্যের দায়দায়িত্ব স্থানান্তরিত হবে। আর যদি এজেন্টের দায়িত্ব কেবল মাল চেক করা, গুনগত মান যাচাই করা হয়; সে মালের দখল বুঝে নেয় না, নিজে

---

১৭. এটি বহু আগের কথা। পরবর্তী সময়ে 'স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানে' (পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে) পৃথকভাবে ইসলামি ব্যাংকিং বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুদমুক্ত ব্যাংকগুলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এ বিভাগই লাইসেন্স প্রদান করে থাকে। এ বিভাগের জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি শরিয়াহবোর্ডও আছে। তা ছাড়া এখন পাকিস্তানে পরিচালিত সকল ইসলামি ব্যাংককে هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية এর শরিয়াহবোর্ড কর্তৃক প্রণীত المعايير الشرعية অনুযায়ী সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা আবশ্যক করে দেওয়া হয়েছে। ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকগুলো সেই অনুযায়ী চলছে কি না কেন্দ্রীয় ব্যাংক সে বিষয়ের তদারকিও করে থাকে। দ্রষ্টব্য : غير سودى بنكارى পৃষ্ঠা : ৩৫৭।

সে মাল প্রেরণও করে না। তা হলে কেবল সার্টিফিকেট ইস্যু করা দ্বারা দায়িত্ব স্থানান্তরিত হবে না।

রপ্তানিতে পণ্যবীমার বাধ্যবাধকতার শরয়ী সমাধান কী?

প্রশ্ন : (আট)

রপ্তানি-বাণিজ্যে একটি সমস্যা এও যে, ক্রেতা বিক্রেতাকে নির্দেশ করে, তুমি প্রথমে পণ্যের বীমা করবে, তারপর তা পাঠাবে। অথচ ইন্সুরেন্স তো শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। এই অবস্থায় আমরা পণ্য ইন্সুরেন্সবিহীন কীভাবে পাঠাবো?

উত্তর : ইন্সুরেন্সের ব্যাপারে কথা হলো, বর্তমানে আমাদের দেশে ইন্সুরেন্সের যতগুলো স্কিম চালু আছে, সবকটিতে সুদ জুয়ার সংমিশ্রণ আছে। অতএব, যতদিন পর্যন্ত এমন ইন্সুরেন্স কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত না হবে, যা এসব অবৈধ কার্যক্রম হতে মুক্ত, ততদিন পর্যন্ত বীমা করা এবং করানো শরিয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয। ইন্সুরেন্স ছাড়া কোনো ব্যবসাবাণিজ্য চলতে পারে না, সব কাজ বন্ধ হয়ে যাবে– একথা তো ঠিক নয়, এটি একটি অমূলক কথা।

রপ্তানি-বাণিজ্যে পণ্য প্রেরণের জন্য যদি এফওবি (FOB) এবং সিএন্ডএফ (C and F) পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়, তা হলে বিষয়টি একেবারেই সহজ। কেননা এই দুই পদ্ধতিতে রপ্তানিকারকের পণ্যবীমা করাতে হয় না। শিপিং কোম্পানির নিকট মাল হস্তান্তর করা দ্বারাই রপ্তানিকারকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে বীমা করানোর দায়িত্ব আমদানিকারকের। শুধু সিআইএফ (CIF) পদ্ধতিতে ইন্সুরেন্সের দায়িত্ব রপ্তানিকারকের, এ পদ্ধতিতে রপ্তানি-কারককেই বীমার দায়িত্ব নিতে হয়। অতএব, যেসকল মুসলিম ব্যবসায়ী রপ্তানি কার্যক্রম আনজাম দিয়ে থাকে, তাদের উচিত হলো, সিআইএফ পদ্ধতি অবলম্বন না করা। বরং FOB অথবা C and F পদ্ধতি অনুসরণ করা, যাতে ইন্সুরেন্সের দায়িত্ব তার উপর না বর্তায়।

পণ্যসামগ্রী মজুদ না থাকলে প্রকৃত বিক্রির শরয়ী হুকুম

প্রশ্ন : (নয়)

আপনার আলোচনায় আপনি যেমনটি বলেছেন, রপ্তানিকারক প্রথমে আমদানিকারকের সাথে এগ্রিমেন্ট টু সেল করবে। প্রকৃত সেল করবে না। তারপর যখন মাল আমদানিকারক বরাবর পাঠিয়ে দেবে, তখন বাস্তব বিক্রি

সংঘটিত হয়ে যাবে। কিন্তু বর্তমানে সাধারণত শুরুতেই প্রকৃত সেল হয়ে যায়। এমন বাস্তব বিক্রি, যাতে এখনও কাঙ্ক্ষিত পণ্য অস্তিত্ব লাভ করেনি। কারও দখলে তো আসেইনি। শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে কি?

উত্তর : আমি যেমনটি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, যদি পণ্য আপনার নিকট বিদ্যমান না থাকে, বরং তা তৈরি করাতে হবে অথবা অন্যকারও ফ্যাক্টরিতে তৈরি করাতে হবে কিংবা তা মার্কেট থেকে ক্রয় করতে হবে তা হলে এসব অবস্থায় প্রকৃত সেল হতে পারবে না। তা শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে না, বরং এক্ষেত্রে এগ্রিমেন্ট টু সেল করতে হবে। তো এ বিষয়ে ক্রেতা যদিও মনে করছে আমি চূড়ান্ত চুক্তি করেছি; আসলে একথার অর্থ হলো আপনার সাথে বিক্রয়ের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি চূড়ান্ত হয়েছে।[৪১]

---

৪১. এক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে বাইয়ে সালাম ও বাইয়ে ইসতিসনাও হতে পারে। ব্যাংক 'সালাম' বা 'ইসতিসনা'পদ্ধতি অবলম্বন করে গ্রাহক থেকে উক্ত মাল পূর্বেই ক্রয় করে নেবে এবং মূল্য পরিশোধ করে দিবে। তারপর মাল প্রস্তুত হয়ে গেলে ব্যাংক তা বুঝে নেবে এবং আমদানিকারকের নিকট পাঠিয়ে দেবে। এক্ষেত্রে 'সালাম' ও ইসতিসনা চুক্তিতে মূল্য এলসিতে উল্লিখিত মূল্য হতে কম নির্ধারণ করবে। এতে করে ব্যাংকের কাঙ্ক্ষিত মুনাফাও অর্জিত হয়ে যাবে। নিম্নে বাইয়ে সালাম ও ইসতিসনার পরিচয় ও তার শর্তাবলি উল্লেখ করা হল।

(بيع السلم) বাইয়ে সালাম কী?

অগ্রিম মূল্য পরিশোধের বিপরীতে ভবিষ্যতে পণ্য সরবরাহের শর্তে পণ্যের ক্রয়মূল্য নগদ পরিশোধ করাকে বাইয়ে সালাম বলে। এ বিক্রয়ে মূল্য নগদে পরিশোধ করা হয় আর পণ্য বিলম্বে। মূলত 'সালাম' (سلم)-এর অর্থ হচ্ছে সমর্পণ করা, এই বিক্রয়ে যেহেতু চুক্তির মজলিসেই পণ্যের মূল্য বিক্রেতার নিকট সমর্পণ করা হয়, এজন্য একে বাইয়ে সালাম বলে। ক্রেতাকে রাব্বুস সালাম, বিক্রেতাকে মুসলাম ইলাইহি, মূল্যকে রা'সুল মালিস সালাম, আর পণ্যকে মুসলাম ফী বলে।

সমাজের এমন অনেক লোক আছে, যাদের সম্পদ বা পণ্য উৎপাদনের ক্ষমতা ও দক্ষতা আছে, কিন্তু প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাবে তারা তা উৎপাদন করতে পারে না। এই অবস্থায় তারা অগ্রিম বিক্রয়ের অনুমতি পেলে বিক্রিলব্ধ মূল্য দ্বারা পণ্য উৎপাদন করতে পারবে, অপরদিকে সমাজে এমন লোকও রয়েছে, যাদের হাতে উদ্বৃত্ত অর্থ রয়েছে; তারা অগ্রিম ক্রয়ের কারণে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে কাঙ্ক্ষিত পণ্য সংগ্রহ করতে পারবে, তাই এই প্রক্রিয়ায় ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের কল্যাণ সাধিত হবে, বিক্রেতার নগদ অর্থের প্রয়োজন পূরণ হতে এবং ক্রেতার অলস অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হবে। উল্লিখিত প্রয়োজনকে সামনে রেখেই মূলত শরিয়ত সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের নিয়মনীতির ব্যতিক্রম এই বাইয়ে সালাম তথা অগ্রিম ক্রয়ের অনুমতি দিয়েছে, তবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম তাকে কঠিনভাবে শর্তযুক্ত করে দিয়েছেন। বাইয়ে সালাম শুদ্ধ হওয়ার জন্য এসব শর্তের উপস্থিতি আবশ্যক। নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে শর্তগুলো উল্লেখ করা হচ্ছে।

বাইয়ে সালামের শর্তাবলি

১. বাইয়ে সালামচুক্তির মজলিসে মূল্য পরিশোধ করে দেওয়া আবশ্যক। চুক্তির বৈঠকে মূল্য পরিশোধ করা না হলে সালামচুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা তখন তা ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রি হবে আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রয়কে অবৈধ ঘোষণা করেছেন। এজন্য ফিকাহবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, বাইয়ে সালামে মূল্য পরিপূর্ণরূপে অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। তবে ইমাম মালিক রহ. এর অভিমত হলো বিক্রেতা ক্রেতাকে ২/৩ দিনের সুযোগ দিতে পারবে; কিন্তু তা চুক্তির নিয়মতান্ত্রিক অংশ হতে পারবে না।

২. বাইয়ে সালাম কেবল সেসব পণ্যে হতে পারবে, যেগুলোর গুণগত মান ও পরিমাণ পূর্বেই পূর্ণরূপে নির্ধারণ করা যায়। যেসব পণ্যের গুণগতমান বা পরিমাণ পূর্ণাঙ্গরূপে নির্ধারণ করা যায় না, সেগুলোতে বাইয়ে সালাম শুদ্ধ হবে না। উদাহরণস্বরূপ, মূল্যবান পাথর সালাম পদ্ধতিতে বিক্রি করা যাবে না। কেননা মূল্যবান পাথর সাধারণত একটির তুলনায় অপরটি গুণগত মান ভিন্ন.হয়, সাধারণত তা বর্ণনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না।

৩. কোনো নির্দিষ্ট বস্তু বা নির্দিষ্ট গাছের ফল বা নির্দিষ্ট কারখানায় উৎপাদিত বস্তুর উপর বাইয়ে সালাম শুদ্ধ হবে না। কেননা পরিশোধের পূর্বেই তা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে, আর এই আশংকার কারণে বিক্রীত দ্রব্য পরিশোধ অনিশ্চিত হয়ে যাবে।

৪. যে দ্রব্যে বাইয়ে সালাম করা হবে তার নাম, ধরন, পরিমাণ, গুনগত মান ইত্যাদি চুক্তিতে উল্লেখ থাকা অপরিহার্য। সালামকৃত দ্রব্যে কোনোধরনের অস্পষ্টতা থাকতে পারবে না যে, তা পরবর্তী সময়ে কোনো প্রকার কলহ-বিবাদের কারণ হতে পারে।

৫. বিক্রত দ্রব্য পরিশোধের তারিখ ও স্থান চুক্তিতে নির্ধারণ করে নিতে হবে।

৬. এমন দ্রব্যে বাইয়ে সালাম করা যাবে না, যেগুলো তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করা অপরিহার্য। যেমন : রুপার বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি, এমন বিক্রিতে তাৎক্ষণিক কবজা (দখল) জরুরি।

বাইয়ে সালাম শুদ্ধ হওয়ার জন্য উপর্যুক্ত শর্তাবলি পাওয়া যাওয়া অপরিহার্য। অন্যথায় বাইয়ে সালাম শুদ্ধ হবে না। এ ছাড়াও ফিকহে হানাফি অনুযায়ী যে দ্রব্যে বাইয়ে সালাম হচ্ছে, সে দ্রব্য চুক্তির তারিখ হতে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত মার্কেটে পাওয়া যাওয়া অপরিহার্য। সুতরাং যদি চুক্তির সময় দ্রব্য মার্কেটে না পাওয়া যায়, তা হলে তাতে বাইয়ে সালাম শুদ্ধ হবে না। যদিও পরিশোধের সময় তা মার্কেটে পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য অন্যান্য মাযহাব অনুযায়ী পরিশোধের সময় তা মার্কেটে পাওয়া গেলেই চলবে।

কোটা ক্রয়-বিক্রয়ের শরয়ী বিধান

প্রশ্ন : (দশ)

রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বাণিজ্যিক কোম্পানির জন্য রপ্তানি কোটা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। এভাবে বলা হয় যে, অমুক কোম্পানি এই পরিমাণ পণ্য রপ্তানি

অনুরূপ ফিকহে হানাফি ও ফিকহে হাম্বলি অনুযায়ী সালামচুক্তিতে পণ্য পরিশোধের তারিখ চুক্তি হতে কমপক্ষে এক মাস বিলম্বে হতে হবে। এর চেয়ে কম মেয়াদে সালামচুক্তি বৈধ হবে না। ফিকহে মালেকি অনুযায়ী এই সময় ন্যূনতম ১৫ দিন হলেই চলবে। তবে ফিকহে শাফিয়ি অনুযায়ী সালামচুক্তির জন্য কোনো মেয়াদের প্রয়োজন নেই। পরিশোধের সময় নির্ধারিত হলেই চলবে। সমকালীন কোনো কোনো ফকিহ এই অভিমত গ্রহণ করেছেন।

(بيع الاستصناع) বাইয়ে ইসতিসনা

ইসতিসনা শব্দের অর্থ তৈরি করানো/প্রস্তুত করানো। আর পরিভাষায় ইসতিসনা বলা হয় প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকে কোনো নির্দিষ্ট জিনিস তৈরীর অর্ডার দেওয়া। যদি এই অর্ডারের ভিত্তিতে প্রস্তুতকারক নিজের মাল দ্বারা উক্ত জিনিস প্রস্তুত করার দায়িত্ব গ্রহণ করে, তা হলে ইসতিসনাচুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে। এই ইসতিসনাচুক্তি শুদ্ধ হওয়ার জন্য আবশ্যক হলো চুক্তির সময়ই কাঙ্ক্ষিত দ্রব্যের মূল্য, প্রয়োজনীয় গুণাবলি নির্ধারণ করে নেওয়া।

ইসতিসনাচুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর প্রস্তুতকারক কর্তৃক উক্ত কাজ করার পূর্বপর্যন্ত উভয়পক্ষ (অপরকে অবহিত করে) এককভাবে চুক্তি বাতিল করতে পারবে। তবে কাজ শুরু করার পর এককভাবে চুক্তি বাতিল করতে পারবে না। তখন উভয়পক্ষের সম্মতি জরুরি।

ইসতিসনা এবং সালামের মধ্যকার পার্থক্য

১. ইসতিসনা কেবল এমন জিনিসে শুদ্ধ হবে, যে জিনিস প্রস্তুত করার প্রয়োজন হয়। আর সালাম যেকোনো জিনিসে হতে পারে, প্রস্তুত করার প্রয়োজন হোক বা না হোক।

২. বাইয়ে সালামে মূল্য সম্পূর্ণভাবে অগ্রিম পরিশোধ করা অপরিহার্য। পক্ষান্তরে ইসতিসনা-চুক্তিতে তা জরুরি নয়।

৩. বাইয়ে সালাম সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পর একতরফা তা বাতিল করা যায় না; পক্ষান্তরে ইসতিসনাচুক্তিতে কাজ শুরু করার পূর্বপর্যন্ত তা এককভাবে বাতিল করা যায়।

৪. বাইয়ে সালামে দ্রব্য পরিশোধের তারিখ নির্ধারণ করা সালাম চুক্তির অন্যতম শর্ত। পক্ষান্তরে ইসতিসনায় পরিশোধের তারিখ নির্ধারণ অপরিহার্য নয়।

উল্লেখ্য, ইসতিসনাচুক্তিতে প্রস্তুতকারক নিজের মাল দ্বারা কাঙ্ক্ষিত জিনিস প্রস্তুত করার দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে। পক্ষান্তরে যদি মাল নির্দেশদাতার পক্ষ থেকে সরবরাহ করা হয়, প্রস্তুতকারক কেবল নিজ দক্ষতা ও শ্রম ব্যয় করে তা প্রস্তুত করে দেয়, তা হলে তা ইসতিসনা হবে না। শরিয়তের দৃষ্টিতে তখন ইজারাচুক্তি হবে।

করতে পারবে। এখন প্রশ্ন হলো, এক ব্যক্তি রপ্তানি করতে আগ্রহী। কিন্তু তার জন্য রাষ্ট্রীয় কোটা বরাদ্দ নেই। অর্থাৎ রাষ্ট্রকর্তৃক রপ্তানির অনুমোদন নেই। ফলে সে অন্য কোম্পানি হতে কোটা ক্রয় করে পণ্য রপ্তানি করে থাকে। তো এ কোটা ক্রয়-বিক্রয় শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে কী?

উত্তর : কোটা হলো একপ্রকার আইনানুগ স্বত্ব। যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে এ কোটা ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কোনো বিধি-নিষেধ না থাকে, তা হলে শরিয়তের দৃষ্টিতে এই কোটা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। তবে একথা মনে করা যাবে না যে, যেকোনো নিরেট স্বত্ব ক্রয়-বিক্রয় শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ। বরং তা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। কোনো কোনো নিরেট স্বত্ব ক্রয়-বিক্রয় বৈধ, আবার কোনো কোনোটি অবৈধ- এর বিস্তারিত বিবরণ আমার একটি প্রবন্ধ 'নিরেট স্বত্বের ক্রয়-বিক্রয়'তে দেখা যেতে পারে। ফিকহি মাকালাতের প্রথম খণ্ডে তা প্রকাশিত হয়েছে।

ফটোযুক্ত গার্মেন্টসামগ্রী সরবরাহের বিধান

প্রশ্ন : (এগারো)

কখনও কখনও বিদেশ থেকে গার্মেন্টসসামগ্রীর এরূপ অর্ডার আসে যে, অমুক ধরনের শার্টের উপর অমুক ফটো তৈরি করে আমাদেরকে সরবরাহ করো। অথচ ওইসব ফটো নগ্ন ছবির অন্তর্ভুক্ত। তো এমন অর্ডার গ্রহণ করা এবং এমন মাল তৈরি করে সরবরাহ করা শরিয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হবে কি?

উত্তর : না, এমন অর্ডারকৃত পোশাক তৈরি করে সরবরাহ করা শরিয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হবে না।

ইংরেজদের পোশাক-পরিচ্ছেদ সরবরাহের বিধান

প্রশ্ন : (বারো)

অনেকসময় লেডিস শার্ট, ব্লাউজ, লেডিস শর্ট প্যান্ট ইত্যাদির অর্ডার আসে, যেগুলো সাধারণত ইংরেজদের পোশাক। তারা এগুলো পরিধান করে। তো এমন অর্ডার সরবরাহ করা শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে কি?

উত্তর : এক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, যদি কোনো পণ্য বা পোশাক এমন হয়, যার বৈধ ব্যবহারও হতে পারে, অবৈধ ব্যবহারও হতে পারে তা হলে এমন পোশাক বা পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ। যদি কেউ তা ক্রয় করে অবৈধ ব্যবহার করে, তা হলে এর গুনাহ ক্রেতার উপর বর্তাবে।

বিক্রেতা গুনাহগার হবে না। কিন্তু যদি উক্ত জিনিস এমন হয় যে, তার বৈধ ব্যবহারই সম্ভব নয়, তা হলে এমন জিনিস ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ।

অপারগতার কারণে বিক্রয়ের অঙ্গীকার পূর্ণ না করা

প্রশ্ন : (তেরো)

যদি কোনো ব্যক্তি কটন বা তুলা রপ্তানির এগ্রিমেন্ট টু সেল করল, কিন্তু ওই বছর কার্পাস তুলার ফলন ভালো হয়নি, বরং তা নষ্ট হয়ে গেছে; এ কারণে রপ্তানিকারক কটন সরবরাহ করতে পারেনি, তা হলে এক্ষেত্রে শরয়ীদৃষ্টিকোণ থেকে কী করণীয়?

উত্তর : যেহেতু প্রকৃত সেলচুক্তি সংঘটিত হয়নি, বরং কেবল এগ্রিমেন্ট টু সেল হয়েছিল আর এখন সময়মতো তা সরবরাহ করা যাচ্ছে না। তো প্রাকৃতিক এই কারণে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করতে না পারায় সে গুনাহগার হবে না। আমদানিকারককে এ বিষয়ে অবগত করিয়ে দেবে যে, এ সমস্যার কারণে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করা যাচ্ছে না। এজন্য এগ্রিমেন্ট টু সেল বাতিল করা হোক। এতে শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো সমস্যা নেই।

রপ্তানিকারক প্রতিশ্রুতি পূর্ণ না করলে

প্রশ্ন : (চোদ্দ)

যদি রপ্তানিকারক ১৫ হাজার কটনবিল (তুলার গাইট) সরবরাহের অঙ্গীকার করে দরদামও নির্ধারণ করে নেয় এবং প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কটন সাপ্লাই শুরু করে। এমনকি দশ হাজার গাইট সরবরাহ করে দিয়েছে। এই অবস্থায় তুলার দাম অনেক বেড়ে গেছে। ফলে রপ্তানিকারক চিন্তা করল যদি পূর্ব নির্ধারিত মূল্যে আমি অবশিষ্ট তুলা রপ্তানি করি, তা হলে অধিক মুনাফা পাব না তাই অবশিষ্ট পাঁচ হাজার গাইট সাপ্লাই বন্ধ করে দিল। আমদানিকারককে সরবরাহ করল না। ইতিমধ্যে সরকার কটন রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল। এই সুযোগে রপ্তানিকারক আমদানিকারককে বলল, সরকারি পাবন্দির কারণে অবশিষ্ট পাঁচ হাজার গাইট তুলা সরবরাহ করতে পারব না। পরবর্তী সময়ে সে পাঁচ হাজার গাইট খোলাবাজারে বিক্রি করে অনেক মুনাফা উপার্জন করল। আমদানিকারককে সরবরাহ করলে এই মুনাফা উপার্জিত হত না। এখন প্রশ্ন হলো রপ্তানিকারকের জন্য এমন করা শরিয়তসম্মত হয়েছে কি না?

উত্তর : নিষেধাজ্ঞা আরোপের পূর্বে যদি তার জন্য অবশিষ্ট কটন রপ্তানি করার সুযোগ থাকে, কিন্তু তার পরও অধিক মুনাফার আশায় নিজের কাছে তা আটকে রাখে এবং আমদানিকারককে তা সরবরাহ না করে, তা হলে সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করল। এ কারণে সে গুনাহগার হবে।

ব্যাংক মুশারাকা করতে সম্মত না হলে

প্রশ্ন : (পনেরো)

আপনি যেমনটি বলেছেন 'ডকুমেন্টস ডিসকাউন্টিং' অর্থাৎ বিল অব একচেঞ্জের বাট্টাকরণ শরয়ীদৃষ্টিকোণ থেকে জায়েয নেই। এজন্য রপ্তানির পূর্বেই ব্যাংক বা অন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে মুশারাকা চুক্তি করে নেওয়া; কিন্তু বিষয় হলো, কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান গ্রাহকের সাথে মুশারাকা বা মুদারাবাচুক্তি করতে সম্মত হয় না। মূলত ব্যাংক আমাদের উপর আস্থা রাখতে পারছে না আর এই আস্থা রাখতে না পারার কারণে 'মুশারাকা' 'মুদারাবা' চুক্তিতে ব্যাংক সম্মত হয় না। তো এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী?

উত্তর : রপ্তানিচুক্তি অত্যন্ত স্বচ্ছ হয়ে থাকে। এতে পণ্য সুনির্দিষ্ট, মূল্য সুনির্ধারিত। লাভের পরিমাণও মোটামুটি সুনির্দিষ্ট। অতএব, মুশারাকা করতে কোনো বাধা নেই। তবে হ্যাঁ, কারও যদি নিয়তই মন্দ হয়, তা হলে কী করা যাবে! তবে এক্ষেত্রে পদ্ধতি হলো রপ্তানিকারকদের পক্ষ থেকে ব্যাংকগুলোর উপর চাপ সৃষ্টি করা যে, আমরা মুশারাকা ব্যতীত অন্যকোনো পন্থায় তোমাদের সাথে লেনদেন করব না। তা হলে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এমনিতেই রাজি হয়ে যাবে।

والله أعلم بالصواب

সমাপ্ত

মাকতাবুল হেরা কর্তৃক প্রকাশিত অনুবাদ ও সৃজনশীল বইসমূহ

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ. এর গ্রন্থসমূহ

- সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস [১-৭]
- নবীয়ে রহমত
- আমার আম্মা
- ঈমান যখন জাগল
- ইসলাম ধর্ম : সমাজ : সংস্কৃতি
- কাদিয়ানী মতবাদ : ইসলাম ও নবীজীর বিপক্ষে বিদ্রোহ
- ছোটদের সীরাতুন্নবী
- প্রাচ্যের উপহার
- শাইখুল হাদিস মাওলানা যাকারিয়া রহ. জীবন ও কর্ম
- কারওয়ানে যিন্দেগী [১-৮]
- সীরাতে রাসুলে আকরাম সা.
- মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারাল?
- ইসলামে নারীর অবদান
- ইসলামী জাগরণের রূপরেখা
- তাযকিয়াহ ও ইহসান [দীনের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ও নবুয়তের মহান উদ্দেশ্য]
- নদবী রহ. এর দাওয়াত ও চিন্তাধারা

শাইখুল ইসলাম মুফতি তাকী উসমানী-এর গ্রন্থসমূহ

- ফিকহী মাকালাত [১]
- ফিকহী মাকালাত [২]
- ফিকহী মাকালাত [৩]
- ফিকহী মাকালাত [৪]
- ফিকহী মাকালাত [৫]
- ফিকহী মাকালাত [৬]
- ব্যবসা-বাণিজ্যের ফাযায়িল ও মাসায়িল
- বেচাকেনার জায়েয-নাজায়েয পদ্ধতি
- ক্রয়-বিক্রয়ের মূলনীতি ও ইসলামী বিনিয়োগপদ্ধতি
- বীমা তাকাফুল : প্রচলিত পদ্ধতি ও শরয়ী রূপরেখা
- ইসলাম ও রাজনীতি
- নাঙ্গা তলোয়ার [গোস্তাখে রাসুল হুঁশিয়ার]
- চেয়ারে বসে নামায পড়ার শরয়ী আহকাম
- বুজুর্গ মনীষীদের নির্বাচিত বাণী
- বিবেকের আদালত ও ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস
- নারীর ভূষণ
- খেলাধুলা ও বিনোদন : শরয়ী সীমারেখা
- বর্তমান প্রেক্ষাপটে ফারেগীন ছাত্রদের দায়িত্ব-কর্তব্য
- ইসলামী সাংবাদিকতা
- হত্যা ও গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে রাসূল সা. এর বাণী
- ইতেকাফের ফাযায়েল ও মাসায়েল
- অমুসলিমদের প্রতি ইসলামের উদারতা
- সূরায়ে ফাতেহার তাফসীর
- আসুন সংশোধন হই
- রেডিও পাকিস্তানে আল্লামা তাকী উসমানী-এর বিষয়ভিত্তিক বক্তৃতা

আকাবির সিরিজ

- হযরত আবুবকর সিদ্দিক রা. জীবন ও সংগ্রাম
- আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. জীবন ও কর্ম
- ইমামু মালিক বিন আনাস রহ. জীবন ও কর্ম
- শাহ হাকিম মুহাম্মদ আখতার রহ. জীবন ও কর্ম
- সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ. জীবন ও কর্ম
- মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশমীরী রহ. জীবন ও কর্ম
- আশরাফ আলী থানবী রহ. জীবন ও কর্ম
- মানাযিরে আহসান গিলানী রহ. জীবন ও কর্ম
- মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. জীবন ও কর্ম
- মাওলানা ইয়াহইয়া কান্ধলভী রহ. জীবন ও কর্ম
- মুফতি মুহাম্মদ শফী রহ. জীবন ও কর্ম
- শাইখুল হাদিস মাওলানা যাকারিয়া রহ. জীবন ও কর্ম
- মাওলানা উবায়দুল হক রহ. জীবন ও কর্ম
- আল্লামা ইউসুফ বানুরী রহ. জীবন ও কর্ম
- মুফতি মুহাম্মাদ তাকী উসমানী : জীবন ও কর্ম
- মুফতী ফজলুল হক আমিনী রহ. [আলোকিত জীবন সংগ্রামী নেতৃত্ব]
- শাইখুল হিন্দ রহ. জীবন ও কর্ম
- আবুল হাসান আলী নদবী রহ. জীবন ও কর্ম
- আকাবিরের ইলম সাধনা : বিস্ময়কর ঘটনাবলী
- বড়দের তাহাজ্জুদ ও রাত জাগরণ
- আকাবিরে দেওবন্দের ছাত্রজীবন
- মুহাম্মদ বিন কাসিম রহ. জীবন ও সংগ্রাম

আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য বই

- মহাপ্রলয়ের পদধ্বনি
- হতাশ হবেন না [২ কালার]
- শানে রিসালাত
- গুনাহমুক্ত জীবন
- সুন্দর জীবন
- হে বোন, কে তুমি? কী তোমার পরিচয়?
- আমালিয়াতে কাশমীরী [পরীক্ষিত তদবীরের একটি কিতাব]
- কোন পথে ইউরোপের ইসলাম?
- এই পৃথিবীর পাতায় পাতায় (ছোটদের গল্প)
- সীরাত ও মিলাদের ব্যবধান
- নাস্তিকতার স্বরূপ সন্ধান
- হাদিসের আলোক আহনাফ ও আহলে হাদিসের নামায
- বার চাঁদের ফাযায়িল ও মাসায়িল
- কবিরা গুনাহ
- মিলাদ-কিয়াম ও হাযির-নাযির [বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা]
- সন্তানপ্রতিপালনের মৌলিক গুণাবলি
- হাদিস অস্বীকারের পরিণতি
- পরকাল [৪ কালার]
- তুমি সেই সৌভাগ্যবতী
- শানে সাহাবা
- কালোজীবন
- কুরআন সংকলনের ইতিহাস
- নারী নেতৃত্বের শরয়ী বিধান
- ১০০ রাবীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
- মহানবী স.-এর প্রতিরক্ষা কৌশল
- ফিলিস্তিনের জন্য ভালোবাসা
- যেভাবে যোগ্য আলেম হবেন
- আলকুরআনে নারীর কাহিনী
- নির্বাচিত ৯৯ মোযাকারা
- তোহফায়ে রমাযান
- ইসলামী শিষ্টাচার
- তারাবীর রাকাত সংখ্যা ৮ না ২০?
- বাকশিল্প [বিজ্ঞানভিত্তিক বক্তৃতার আধুনিক কলাকৌশল
- এই সেই লেলিহান আগুন
- হাদীস ও আহলে হাদীস
- আহলে হাদিসসম্প্রদায় [ইতিহাস, ভ্রান্তি ও তার সমুচিত জবাব]
- ইমাম বুখারীর দৃষ্টিতে লা-মাযহাবী
- ফিকহে হানাফীর শ্রেষ্ঠত্ব
- জীবনের লক্ষ্য
- মুসলিম নারীদের কীর্তিগাথা
- সহজে আরবী শিখি
- খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.
- বড়দের দৃষ্টিতে সময়ের মূল্য
- আরব বিশ্বে ইসলামী শাসনের পতন
- এ যুগের পয়গাম
- আদর্শ শিক্ষক : রাসূলুল্লাহ সা.
- আমালে কুরআনী
- বক্তৃতার আসর
- আহকামে সফর
- মানবতার বৈশিষ্ট্য
- মুহাম্মদ বিন কাসিম [ইহসাক ভাট্টি]
- কুরবানির ইতিহাস ও মাসায়েল
- ভোট ও নির্বাচনের শরয়ী বিধান
- আপনি কেন মাযহাব মানবেন
- আহলে হাদিসের কাঠগড়ায় সহীহ্ বুখারী
- আত্মার পরিচয়
- মহানবী সা. এর প্রতিরক্ষা কৌশল
- আধুনিক আরবী যেভাবে বলবেন
- মুহাম্মদ বিন কাসিম [মেজর জেনারেল আকবর খান]
- আহলে হাদীসের প্রতারণার মুখোশ উন্মোচন
- নীল সবুজের দেশে
- উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম সা.
- আলাইকুম বিসুন্নাতি
- কালিলা ও দিমনার বুদ্ধির গল্প
- বিনিদ্র রজনীর সাধক যারা
- যিকর ও ফিকর
- মধ্যপ্রাচ্যে হাফেজ্জী হুজুর রহ.
- মৃত্যুর সাথে বসবাস
- অসুস্থ ব্যক্তির পবিত্রতা ও নামাযের মাসায়েল
- মুমিনের মাস ও বছর